নারীনিগ্রহ

আল মাহমুদ

নারীনিগ্রহ

আল মাহমুদ

সংবাদপত্রে প্রকাশিত লেখকের ২৫টি নারী বিষয়ক রচনা
রচনাকাল ঃ ১৯৮৪--১৯৯৫

প্রীতি প্রকাশন
৪৩৫/ক, বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭
ফোনঃ ৮৪১৭৫৮, ফ্যাক্সঃ ৮৮০-২-৮৩৯৫৪০

www.pathagar.com

নারীনিগ্রহ
আল মাহমুদ

প্রকাশক
আসাদ বিন হাফিজ
প্রীতি প্রকাশন
৪৩৫/ক, বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭
ফোনঃ ৮৪১৭৫৮, ফ্যাক্সঃ ৮৮০-২-৮৩৯৫৪০

প্রথম প্রকাশ
বইমেলা ১৯৯৭
[আন্তর্জাতিক নারী দিবস '৯৭ উপলক্ষে প্রকাশিত]

স্বত্ব
সৈয়দা নাদিরা মাহমুদ

প্রচ্ছদ
প্রীতি ডিজাইন সেন্টার

প্রচ্ছদ স্কেচ
হুজ্জাতুল্লাহ সাকিবা (ইরান)
[ইরান কালচারাল সেন্টার ঢাকার সৌজন্যে প্রাপ্ত]

মুদ্রণ কম্পিউটার কম্পোজ
প্রীতি কম্পিউটার সার্ভিস

মুদ্রণ
প্রত্যয়ন প্রিন্টার্স এন্ড প্রডাক্টস লিঃ

দামঃ ৬০.০০

NARINIGGRHA
BY:
AL MAHMUD
Published by:
Asad Bin Hafiz
Preeti Prokashon
435/Ka, Bara MoghBazar, Dhaka-1217
Phone: 841758, 839540 Fax: 880-2-839540
Published on:
Book Fair 1997
Price:
Taka 60.00
$ 2

www.pathagar.com

উৎসর্গ

শাহ আবদুল হান্নান

www.pathagar.com

প্রীতির কয়েকটি প্রবন্ধগ্রন্থ

ইসলামী সংস্কৃতি / আসাদ বিন হাফিজ
বাইবেল কোরআন বিজ্ঞান / ডঃ মরিস বুকাইলি
বিজ্ঞানের আলোকে মানুষের স্বভাবধর্ম / সিরাজ চৌধুরী
এ ইসলাম ইসলামই নয় / মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নী
আল কোরআনের বিষয় অভিধান / আসাদ বিন হাফিজ
রমজানের তিরিশ শিক্ষা / এ. এন. এম. সিরাজুল ইসলাম
ভাষা আন্দোলন ডান-বাম রাজনীতি / আসাদ বিন হাফিজ
সহজ কোরআন শিক্ষা পদ্ধতি / খোন্দকার এ. এস. এম শাহ্ আলম

www.pathagar.com

সূচীপত্র

সত্যের চেহারা	৭
জমাটবাঁধা অন্ধকার	১১
বেশ্যাবৃত্তির রকমফের	১৪
বয়ঃসন্ধির পাশবিকতা?	১৭
বাঁচতে হলে বেচতে হবে	২০
প্রাণ ধারণের গ্লানি	২৩
বুদ্ধিজীবীদের ভারসাম্যহীনতা	২৬
চিন্তাচর্চার শূন্যগর্ভ ইমারত	২৯
বিনষ্টির মহানির্দেশ	৩২
ধরিয়ে দিন	৩৬
সাংস্কৃতিক বেহায়াপনা	৪০
একটু আড়াল চাই	৪৩
যে সত্য দুর্বহ	৪৬
জীবনের ছটফটানি	৪৯
নারী পাচার	৫৩
মানুষ-নারী শুধু দেহ-সর্বস্ব নয়	৫৬
তসলিমার ব্যাপারে বাইরের খবরদারি	৫৯
ওড়নার ওপর নিষেধাজ্ঞা ঃ ভয় না প্রতিশোধ?	৬৪
তসলিমাকে নিয়ে পৃষ্ঠপোষকদের সমস্যা	৬৭
তসলিমার নতুন তামাশা	৭১
সংসদে "দ্বিতীয় তসলিমা" প্রসঙ্গ	৭৫
এক ইতির ইতিকথা	৮০
বস্তুনিষ্ঠতার আড়ালে অশ্লীলতা	৮৪
ওড়না সংকট ঃ বেনজীরের পরামর্শ ও ফ্রান্স	৮৮
অপরাধের ঘটনা সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে	৯২

www.pathagar.com

লেখকের অন্যান্য প্রবন্ধগ্রন্থ

দিনযাপন

কবির আত্মবিশ্বাস

www.pathagar.com

সত্যের চেহারা

নৈতিকতার অধঃপতন বাংলাদেশকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলতে চাইছে। একে তো রাজনৈতিক বিক্ষোভ বিরোধে দেশের এক টালমটাল অবস্থা। তার সাথে সামাজিক অধঃগতি, অশ্লীলতা, নেশা, ঘুষ ও চুরির একটা স্রোত বইছে। সমগ্র সমাজটাই যেন বর্তমানে নৈতিকতার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে। লজ্জা ও আবরণ যা এককালে মেয়েদের ভূষণ ছিল, সম্প্রতি তা অন্তর্হিত হতে চলেছে। আমাদের সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রগুলোতে যেখানে এক সময় উন্নত রুচির আদর্শবাদ ব্যক্ত হতো, ব্যক্ত হতো মানুষের সুন্দরভাবে বাঁচার আকাংখা–সম্প্রতি সেখানে যৌনতার স্তবস্তুতি আসন গেড়ে বসেছে। একদা ধার্মিক স্বভাবের মানুষকে যেখানে নির্ভরযোগ্যতার প্রতীক হিসাবে বিবেচনা করা হতো সেখানে বিশুদ্ধ নাস্তিকতা কিম্বা এ্যাগনষ্টিক দোদুল্যমানতা এসে এক ধরনের লুচ্চামির আবহাওয়া ও পরিবেশ তৈরী করতে সক্ষম হয়েছে। দেশের কোন কিছুতেই আর এখন উন্নত মানবিক কোনো গুণ নেই। তরুণদের বিনোদনের উপায় হয়েছে এখন ভিসিআর-এ ইম্মান্যুয়েল জাতীয় ছদ্মবেশী ব্লু ফিলম। নিষিদ্ধ চলচ্চিত্র এখন ঢাকার মেট্রোপলিটান সীমানা পার হয়ে প্রথমে মফস্বল শহর তারপর বিদ্যুতের ব্যবস্থা আছে এখন সব গ্রামাঞ্চল পর্যন্ত এর দিগ্বিজয়ের পরিধি বাড়িয়েছে। সবকিছু দেখে শূনে মনে হয় আমাদের বুঝি আর কোনো আশা নেই। আল্লার নীতিমালার দ্বারা শাসিত একটি মানবিক জীবন ও সামাজিক ব্যবস্থা প্রবর্তনের একদা আমাদের পূর্বপুরুষদের যে একটা স্বপ্ন ছিল আমাদের অযোগ্যতা ও মোনাফেকীর কারণে আমরা বুঝি এর থেকে অনেক দূরে সরে গেছি।

মানি, আমার উপরোক্ত বিবরণে খানিকটা হতাশার গন্ধ আছে। সত্যের চেহারা অনেক সময়ই মানুষকে আশাভঙ্গের বেদনা দেয় তবুও সত্যের চেহারা নির্বিকার চিত্তে অবলোকন করতে না পারলে আদম সন্তানের যূথবদ্ধ সমাজে যারা আশা উদ্দীপনা জাগিয়ে তুলতে চান তারা সহজভাবে কাজ করতে পারেন না। এই নিবন্ধ লেখক যেহেতু কোনো হতাশাবাদী মানুষ নন বরং আল্লার বিধানে বিধৃত একটি আত্মসমর্পিত সমাজ নির্মাণের নিরলস কর্মী সে কারণে নিজের পরিবেশ সম্বন্ধে একটি নির্বিকার চিত্র উত্থাপন করেই তার আশাবাদ ব্যক্ত করতে চান।

আশার কথা এই যে পঙ্কিলতার মধ্যেও আমরা এমন কিছু তরুণের সন্ধান পাই যারা পরিবেশের কাছে আত্মসমর্পণ না করে, সর্বগ্রাসী পঙ্কিলতার মধ্যে গা ভাসিয়ে না দিয়ে অত্যন্ত সতর্কতার সাথে এর বিরোধিতার জন্য সংঘবদ্ধভাবে দাঁড়াতে চাইছেন।

www.pathagar.com

আমরা তাদের চিনতে পারি তাদের মুখের মৃদু অফুরন্ত হাসি দেখে। তারা যখন নামাযের পর মসজিদ থেকে বিনম্র মুখে বেরিয়ে আসেন, তাদের পরিচ্ছন্ন ললাটে সিজদার অবছা দাগ দেখে। হাঁ, সন্দেহ নেই, আমি সেইসব যুবাদের কথাই বলতে চাইছি যারা এ দেশের ইসলামী আন্দোলনের সাথে দৃঢ়ভাবে জড়িত। যারা বাংলাদেশে একটি ইসলামী সমাজ ও শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য আল্লার ইচ্ছার কাছে উৎসর্গীকৃত। এরাই এদেশের আশা এবং আন্তর্জাতিকভাবে ভবিষ্যত মানব সমাজের আশা ভরসা। আমরা এদের কথায় পরে আসছি। আবিলতার স্রোতে যারা মাছির মত আটকে পড়েছে আগে তাদের কথা একটু আলোচনা করে নিতে চাই।

সামগ্রিকভাবে বাংলাদেশের যুবশক্তির কোনো নৈতিক মানকে সনাক্ত করা এক দুরূহ কাজ। আমাদের ঘরে-বাইরে যেসব যুবক-যুবতীদের আমরা প্রতিনিয়ত দেখি। কথা বলি কিম্বা সামাজিক আদান-প্রদানে অভ্যস্ত তারা কারা? তারা যে আমার কিম্বা আমারই মতো কোনো মুসলিম পিতার সন্তান এতে কোনো দ্বিমত থাকতে পারে না। শেষ পর্যন্ত কথাটা দাঁড়ায় এইসব ছেলেমেয়েরা আমদেরই ছেলে-মেয়ে। যদিও বর্তমান সামাজিক পরিবেশে এরা পিতামাতার ইচ্ছানুযায়ী গড়ে উঠতে পারেনি তবুও এ কথাতো অস্বীকার করা যায় না এদের মুখের আদলে অস্পষ্ট হয়ে আছে আমাদেরই মুখ। আমাদেরই ব্যর্থতার গ্লানিতে সাঁতার কেটে এরা জীবনের ডাঙায় উঠে দাঁড়াতে চাইছে। এদের পুঁজি হলো মূর্খতা, বেয়াদবী, অশ্লীলতা ও অনৈতিক আচরণ। বিনোদনের অর্থ সম্প্রতি এদেশের যুবক-যুবতীদের কাছে দাঁড়িয়েছে নগ্নতা বলে। এরা সব কিছুকে উদোম করে ফেলতে চায়। চায় নিজেরাও সম্পূর্ণ নেংটো হয়ে যেতে। এই আবরণহীনতার মধ্যে এরা কোনো লজ্জা-শরম দেখতে পায় না। একজন যুবতীর জন্যে নিরাবরণ বে-পর্দা অবস্থাটি সামাজিক লজ্জার কারণ এ কথার কোন বোধ বা উপলব্ধি গত চার-পাঁচ দশক ধরে আমাদের শিক্ষা-দীক্ষা, সামাজিক আচরণ ও সাংস্কৃতিক কর্ম-কাণ্ডের মধ্যে না থাকায় এই সময়কালে বেড়ে ওঠা যুবশক্তির মধ্যে তা সঞ্চারিত হয়নি। এ কারণেই আজ যদি একটি মেয়ের কাছে নারীর স্বাভাবিক আবরণকে অসহনীয় বলে মনে হয় তখন কাকে দোষ দেব?

আমাদের দেশে শাসন ক্ষমতায় যারা অধিষ্ঠিত থাকেন তারা যখন যে-ই আসুন না কেন তারা ইসলামের কথাই বলেন। বলেন, ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা কায়েমই তাদের লক্ষ্য। ইসলাম যে একটা পরিপূর্ণ মানবিক জীবন বিধান তা তারাও স্বীকার করেন। যেখানে যে রকম কথা বললে দেশবাসী খুশী হবে তারা তাই করেন। ইসলামের কথা বলতে বলতে ইসলামের ক্ষতি সাধন ও মুসলিম নর নারীর জীবনকে দুর্বিষহ করাই এদের আসল উদ্দেশ্য। এ উদ্দেশ্য অবশ্য কিছু কালের জন্য আপাত সাফল্য অর্জন করলেও শেষ পর্যন্ত আল্লাহই যেমন সর্বকালে মোনাফেকদের ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে নিক্ষেপ করে এসেছেন, তারাও তেমনি ইতিহাসের জঞ্জালের ওপর হাড়গোর সমেত

www.pathagar.com

খাবি খেতে থাকেন। আবার আরেক শাসক এসে মোনাফেকীর পুরানো পৃষ্ঠাগুলোই উল্টে যান মাত্র। ইসলাম আসে না বটে, কিন্তু ইসলামী ব্যবস্থা কায়েমের মিথ্যা দাবীদাররা নিজেদেরই তৈরী পথ বেয়ে নিজেদেরই কফিন বয়ে নিয়ে জাহান্নামের দিকে হারিয়ে যেতে দেখা যায়।

আমাদের যুব শক্তিকে মানবিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধ থেকে সরিয়ে নেয়ার জন্য এদেশের অতীতের শাসকগোষ্ঠিই দায়ী। কোনো উচ্চ আদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্য তারা কখনো এ দেশের দিশেহারা যুবশক্তিকে আহ্বান জানাননি। ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধি ও রাজনৈতিক সুবিধাবাদই দেশের যুবশক্তিকে বারবার শাসন-ক্ষমতার উত্থান-পতনে অন্যায় সহযোগিতা করতে ডাক দিয়েছে। এর ফলও হয়েছে মারাত্মক। আমাদের যুবশক্তির মন থেকে যে জিনিসটি চিরকালের মত উধাও হয়ে গেছে বলে মনে হচ্ছে সে মানবিক গুণের নাম শ্রদ্ধা।

বয়ঃজ্যেষ্ঠের বা নেতৃত্বের প্রতি কোনো শ্রদ্ধাবোধ নেই আমাদের যুবক-যুবতীদের। একবার কথা প্রসঙ্গে এক যুব-কর্মীকে আমি তার বয়ঃবৃদ্ধ নেতার প্রতি অভদ্র উক্তির সমালোচনা করলে সে জবাবে বলেছিলো, একটা বটগাছের একশ বছর বয়স হয়েছে বলেই কি আমরা তার পূজো করবো? বেশী বয়স হলেই রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যে বেশী মানবিক গুণ বর্তায় না। ধূর্ত শুধু ধূর্তামিতে পাকা হয়।

এই কর্মীটির কাছে বয়স্কের প্রতি সম্মান কোনো ব্যাপারই নয়। সে তার পরিবেশের মধ্যে যে চালাকি, কূট ষড়যন্ত্র ও মানুষের প্রতি মানুষের অসম্মান দেখেছে তাতে এই সিদ্ধান্তে আসতে বাধ্য হয়েছে যে, প্রাজ্ঞের কোন মূল্য নেই। এক সাম্যবাদী যুবক তার রাজনৈতিক সহকর্মিনী এক যুবতী সম্বন্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে চরম অসহিষ্ণুতার সাথে উচ্চারণ করেছিল, ঐ ছেনাল মাগীর কথা আপনাকে কি আর বলবো---- ইত্যাদি। আমি যুবকটির কথা শুনে কিছুক্ষণ স্তম্ভিত হয়ে ছিলাম, পরে অবশ্য নিজেকে এই বলে সান্ত্বনা দিয়েছি যে, এর নৈতিক বা ধর্মীয় কোনো শিক্ষা নেই বলে পারস্পরিক মর্যাদাবোধ সে অর্জন করেনি। কিন্তু তখন আমি একবারও ভেবে দেখিনি, এই ছেলেটির সমসাময়িক জেনারেশনেরও তো একই অবস্থা হতে বাধ্য।

আবার এর উল্টো পিঠও যে নেই এমন নয়। এ প্রসঙ্গেও দু'কথা বলা উচিত বলে আমি মনে করি। একবার জনৈকা যুবতী পেশাগত কারণে আমার সাথে সাক্ষাৎ করতে এলে আমি দেখলাম তার প্রসাধন চর্চিত মুখের চেয়ে তার শরীর আরও উগ্রভাবে নিরাবরণ। সে শাড়ি পরেনি এমন নয়, কিন্তু শাড়ি পরার সাম্প্রতিক স্টাইলটাই এমন যাতে তার পেট, পিঠ ও স্কন্ধদেশ সম্পূর্ণ উন্মুক্ত। আমার কেন জানি মনে হলো মেয়েটি একটু সরল প্রকৃতির। যুগের হাওয়ায় বেড়ে ওঠা গাছের মত। নিজের লজ্জা-শরমের ব্যাপারে উদাসীন কিম্বা নির্বোধ। আমি সাদর সম্ভাষণসহ তাকে বসতে বলে চা আনতে হুকুম দিলাম। চা খেতে খেতে তাকে একজন মুসলিম নারীর আত্মসম্মানবোধ, পোশাক

www.pathagar.com

ও আবরণীয় অঙ্গ সম্বন্ধে পবিত্র কোরান-হাদিসে উল্লিখিত বিধি-নিষেধের কথা তুললাম। মেয়েটি প্রথমে বোরখা-টোরখা সম্বন্ধে খুব বেয়াড়া ধরনের উক্তি করলেও আমার উক্তির কাছে হেরে যেতে বাধ্য হলো। ইউরোপ-আমেকিরার নারী স্বাধীনতার বাজে যুক্তিগুলোর আর পুনরাবৃত্তি না করে সহসা মাথায় কাপড় তুলে দিল। শাড়ি দিয়ে পেট ও পিঠ ঠিকমত ঢেকে নিয়ে অত্যন্ত নম্রকণ্ঠে আমার প্রশ্নের জবাব দিতে লাগলো। বুঝলাম বাইরে মেয়েটির উগ্রতাটা তার আসল রূপ নয়। তার আসল রূপ ভেতরের এক লজ্জাশীলা মুসলিম যুবতীর। পরবর্তীকালে তাকে যতবার দেখেছি, দেখেছি পোশাক বা স্টাইল শালীনতার সীমা অতিক্রম করে যায়নি। আমাকে দেখলেই মাথায় কাপড় তুলে দিয়েছে। চোখ নামিয়ে বলেছে, আসসালাম।

আমি অবশ্য তাকে বোরখা বা চাদর পরাতে পারিনি। সম্ভবত এটাই আমার দাওয়াতের দুর্বলতা।

এই দুর্বলতা যারা কাটিয়ে উঠেছেন সেই মুসলিম যুবকদের কথাই আমি আগে আমার নিবন্ধের এক জায়গায় উল্লেখ করেছি, নামাজের সময় আমি তাদের বিভিন্ন মসজিদের কাতারে দেখি। নামাজ শেষে যখন তারা বেরিয়ে আসেন তাদের মুখে থাকে মৃদু অথচ অফুরন্ত হাসি। ললাট রেখায় সিজদার চিহ্ন। তারাই এ যুগের শালীনতার সামাজিক সুব্যবস্থার আর খোদা ভীরুতার অগ্রদূত। তাদের হাতেই মুসলিম নারীকুল তাদের আল্লাহপ্রদত্ত নিরাপত্তা ফিরে পাবে।

আগেই বলেছি এদেশের শাসককুল যে যেভাবেই শাসন ক্ষমতায় আসুক না কেন মুখে ইসলামী সমাজ কায়েমের কথা বলেছে। তাদের কথায় বিশ্বাস স্থাপন করে দেশের মানুষ আখেরে এদের মোনাফেকী ও নির্মম পতন প্রত্যক্ষ করেছে। কেউ কথা রাখেনি। কেন রাখবে, তারাতো কোন ইসলামী চিন্তা-চেতনার পথ ধরে ক্ষমতায় আসেনি। যারা ইসলামী আন্দোলনের পথ ধরে ক্ষমতায় আসে না তাদের পক্ষে ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা অর্থাৎ ইসলামী শরীয়ত প্রবর্তন করা সম্ভব নয়। একমাত্র ইসলামী আন্দোলনের পথ ধরে গণতান্ত্রিক উপায়ে যারা দেশের ক্ষমতায় আসবেন তারাই পারবেন জীবন ব্যবস্থা হিসাবে এদেশে ইসলামকে প্রবর্তন করতে। যদি অবশ্য গণতন্ত্রের দরজা-জানালা খোলা থাকে। তা না হলে বর্তমান পৃথিবীর কয়েকটি দেশে ইসলাম তার স্ব-মর্যাদায় যেভাবে নিজের নিশান উড়িয়েছে বাংলাদেশও তার থেকে বঞ্চিত থাকবে বলে মনে হয় না। আর ইসলামী আন্দোলনের বাইরে থেকে যারা দেশে ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা কায়েমের কথা বলেন তাদের সদিচ্ছায় সন্দেহ না করেও বলা যায় তাদের দ্বারা তা সম্ভব হয় না, অতীতেও তা সম্ভব হয়নি। এ জন্য আজীবন ইসলামী আন্দোলনের সাথে জড়িত থাকা ইসলামী সমাজ প্রবর্তনের এক অপরিহার্য শর্ত।

৮/৩/৮৪

www.pathagar.com

জমাটবাধা অন্ধকার

বাংলাদেশের সমাজ জীবনে এক অসহনীয় অস্থিরতা নেমে এসেছে। এই অস্থিরতার তরঙ্গে যেমন পরিবার ভাঙছে তেমনি ভেসে যাচ্ছে মানবতা ও নৈতিকতাবোধ। প্রাচীন সর্বপ্রকার মূল্যবোধই যে মুখ থুবড়ে পড়েছে তা নয়। স্থিরতার কোনো একটা খুঁটি ধরে দাঁড়াবারও তার আর শক্তি নেই। সন্দেহ নেই এই অস্থির অবস্থার প্রধানতম কারণ অর্থনৈতিক। অর্থনৈতিক দুরবস্থা নিম্নবিত্ত পরিবারগুলোকে শিকড়শুদ্ধ উপড়ে ফেলতে চাইছে। গ্রামের জীবনে-একদা শত দুঃখের মধ্যেও শান্তি ও স্বস্তি ছিল। গত দেড় দশক ধরে তার চিহ্নমাত্র অবশিষ্ট নেই। গ্রাম হয়েছে দুর্নীতি ও দুষ্কৃতির আখড়া। বহুকাল যাবত বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চল থেকে ন্যায়বিচার, পারিবারিক ও দুর্বল মানুষের নৈতিক নিরাপত্তার অস্তিত্ব প্রায় নেই বললেই চলে। এ পর্যন্ত বাংলাদেশের শাসন-ক্ষমতায় যারাই অধিষ্ঠিত হয়েছেন তারাই গ্রামের কথা বেশ জোরেশোরে বলেছেন। বলেছেন, বাংলাদেশ মানেই গ্রাম। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ঐ সমস্ত ছেদো কথার কোনো মূল্যই নেই। দেশবাসী জানে বাংলাদেশ মানেই হল তেষট্টি বা চৌষট্টি হাজার গ্রাম। আসলে এসব কথা সত্য নয়। বাংলাদেশ মানে হল একটি মাত্র শহর। আর সে শহরটি হল রাজধানী ঢাকা। ঢাকা ছাড়া চাকা ঘুরে না। ঢাকাই বাংলাদেশের সুখ, ঢাকাই স্বপ্ন। যত উন্নয়ন পরিকল্পনা ও প্রাধান্য সব এই হঠাৎ ফেঁপে ওঠা মহানগরীর পেটের ভেতর। যারা গ্রামের কথা বলেন তারা রাজনৈতিক কারণে বলতে হয় বলেই বলেন। যারা রাজনৈতিক বক্তৃতা-বিবৃতি ঝাড়তে কয়েক ঘন্টার জন্য গ্রামে যান তারা সন্ধার আগেই ঢাকায় ফিরে এসে পায়ের কাদা ধুয়ে ফেলেন। আসলে আমাদের সবার কাছেই অবচেতন মনে ঢাকা শহর মানেই বাংলাদেশ। ঢাকার বাইরের বিপুল গ্রামাঞ্চল প্রকৃতপক্ষে সকলের কাছেই দুঃস্বপ্ন। দুঃস্বপ্ন হবে নাই-বা কেন, ঢাকার বাইরে পুরা দেশেটাইতো বলতে গেলে অন্ধকার। সেখানে যারা বাস করে তারা অন্ধকারের প্রাণী। সেই প্রাণীদের মধ্যে যারা মাতবরী করে যেমন কিছু পরিমাণ গ্রাম্য টাউট, ইউনিয়ন পরিষদের কর্তাব্যক্তি ও জোতদার-জমিদার- বাংলাদেশকে যেন তারা হাজার বছরের কিম্বা অনন্তকালের জন্য ইজারা নিয়েছে। তারা যেমন ইচ্ছা তেমনিভাবে সামাজিক ন্যায়নীতির উত্থানপতন ঘটায়। তারা কোনকালেও মানুষের দুঃখা উপবাসের মূল্য দেয়নি। মানুষের ইজ্জত হুরমত এদের কাছে এক কানাকাড়িরও মূল্য পায় না।

অন্ধকারাচ্ছন্ন বাংলাদেশের গ্রাম যেমন রাজধানী ঢাকা শহরের আহার-বিহার, আরাম-আয়াশ ও আমোদ-প্রমোদের যোগানদার তেমনি এই পাপনগরীর পাপ

www.pathagar.com

পিপাসারও সম্ভবত নির্বিকার যোগানদার। সম্প্রতি নিরন্ন চাষী পরিবারের অপ্রাপ্ত বয়স্ক মেয়েদের বেশ্যাবৃত্তিতে নিয়োজিত করতে ঢাকার আশপাশ এলাকার উপশহর ও খোদ মহানগরীর বেশ্যালয়গুলোর পরিচালকরা যেন উম্মাদ হয়ে উঠেছে। প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চল থেকে আহার, বাসস্থান ও কাজের লোভ দেখিয়ে ঐসব অপ্রাপ্ত বয়স্ক মেয়েদের ধরে এনে পাশবিক নির্যাতনের মধ্যে আটকে রেখে বেশ্যাবৃত্তিতে বাধ্য করা হচ্ছে।

বেশ কিছুকাল যাবত সংবাদপত্রে গ্রাম্য কিশোরীদের ধরে এনে ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ ও অন্যান্য মফস্বল শহরগুলোর বেশ্যালয়ে নাম লেখাবার খবর ছাপা হচ্ছে। কিন্তু যে ধরনের প্রশাসনিক ও সামাজিক প্রতিকার একান্ত প্রয়োজন, তা গ্রহণ করা হয়নি। সম্প্রতি প্রশাসনের এ দুর্বলতা দেখে দুর্বৃত্তরা গ্রামের নিঃসম্বল মুসলিম চাষী পরিবারের অসহায় অপ্রাপ্ত বয়স্ক মেয়েদের দিকেও হাত বাড়াতে কসুর করছে না। ঐসব মেয়ে ধরা দালালদের দুঃসাহস এতটা বৃদ্ধি পেয়েছে যে, এরা বোধহয় কিছুদিন পর সম্ভ্রান্ত ঘরের অসহায় মুসলিম মেয়েদের ওপরও হাত দিতে পরোয়া করবে না। ব্যাপারটার একটা সীমা থাকা উচিত বলে আমরা মনে করি।

সম্প্রতি সংবাদপত্রে শবমেহের নামে এগারো বছরের একটি অপ্রাপ্ত বয়স্ক মুসলিম কিশোরীর নারায়ণগঞ্জের বেশ্যালয়ে দুই হাজার টাকায় বিক্রি হওয়ার কাহিনী প্রকাশিত হয়েছে। এই মেয়েটিকে জরিনা নামের এক মেয়ে ধরা দালাল বেশ্যাপল্লীতে বিক্রি করে গেছে। মেয়েটিকে শেষপর্যন্ত অজ্ঞান অবস্থায় ট্রেনের কামরা থেকে উদ্ধার করা হয়েছে। সে এখন মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

পরবর্তী সময়ে এই মেয়েটির কাছে সংবাদ সংগ্রহ করে পুলিশ নারায়ণগঞ্জের বেশ্যাপল্লী থেকে অনুরূপ আরও চারটি মুসলিম কিশোরীকে বন্দী অবস্থা থেকে উদ্ধার করে। আমরা জানি না, শবমেহেরসহ এইসব মুসলিম কৃষক পরিবারের অসহায় কিশোরীদের ভাগ্যে কি আছে। তবে আপাতত এরা বেশ্যালয়ের পঙ্কিলতা থেকে উদ্ধার পেয়েছে।

এইসব সংবাদ সামাজিক বিচারবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষের কাছে ক্রমশই যে অসহনীয় হয়ে উঠছে তা আমরা বুঝতে পারছি এবং এব্যাপারে দেশবাসীর কাছে এবং দেশের শাসন কর্তৃপক্ষের কাছে আমাদের কিছু বক্তব্য আছে। আমাদের বক্তব্য হল অতীত ঔপনিবেশিক আমলে 'আউট অব বাউণ্ড' এলাকায় কদাচ এক আধটি মুসলিম পরিবারের মেয়ের নাম কোর্টের খাতায় থাকত। তাও আবার মারাত্মক কোনো অঘটন না ঘটলে এধরনের পঙ্কিল পথে মুসলিম কৃষক পরিবারের মেয়েরা শত দুঃখ-দারিদ্র্যের মধ্যেও পা বাড়াত না। নিতান্তই ভাগ্যবিড়ম্বিত ও পা পিছলে না গেলে সাধারণ মুসলিম কৃষক পরিবারগুলো শালীনতার খুঁটি অর্থাৎ গ্রামের মাটি কামড়ে পড়ে থাকতো।

গ্রামের নিম্নবিত্ত ও ভূমিহীন কৃষক পরিবারগুলোর অবস্থার আজও তেমন কোনো পরিবর্তন সাধিত হয়নি। পাকিস্তান হয়েছে পাকিস্তান গেছে। বাংলাদেশ বর্তমানে

www.pathagar.com

একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র। তবুও কে-না জানে, বাঙালী মুসলিম নিম্নবিত্ত ও ভূমিহীন চাষীদের ভাগ্যের কোনো পরিবর্তন সাধিত হয়নি। তখনও যেমন তারা বিত্তবান শহুরে গুটিকয় শোষকের দ্বারা শোষিত হয়েছে। এখনও তেমনি। তবে অতীতের চেয়ে বর্তমান অবস্থার পার্থক্য এই ঃ আগে এরা অর্ধাহারে অনাহারে থেকেও মোটামুটি মান-ইজ্জত নিয়ে পারিবারিক জীবন কাটিয়ে দিতে পারতো। কিন্তু বর্তমানে বুঝিবা তা-ও আর সম্ভব হচ্ছে না। শবমেহেরের মত মুসলিম চাষী পরিবারের উঠতি কিশোরীদের দিকে পাপ পঙ্কিল ঢাকা নগরীর বেশ্যালয়গুলোর নজর পড়েছে। বেশ্যালয়ের ছদ্মবেশী দালালরা মা-মাসীর ছদ্মবেশে এখন কিশোরী সংগ্রহের জন্য গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়াতে শুরু করেছে। মানবতার দোহাই দিয়ে এদের কোনদিন ঠকানো যায়নি। আজও যাবে না।

এর একটা শক্ত প্রতিকার আমরা শাসন কর্তৃপক্ষের কাছে কামনা করছি। করছি, সন্দেহ নেই ইসলামের নামে। আমরা অকপটে জানিয়ে দিতে চাই, ইসলামে বেশ্যাবৃত্তি হারাম। যে দেশে শতকরা নিরানব্বুই জন অধিবাসী ইসলামের অনুসারী, সে দেশে বেশ্যালয় থাকতে পারে না। অথচ বাংলাদেশে এমন একটাও শহর পাওয়া যাবে না যেখানে এই পাপের বস্তির অস্তিত্ব নেই। কেন এই অবস্থা?

আমরা দৃঢ়ভাবে এই পাপাচারের উচ্ছেদ কামনা করছি। আমরা জানি, আকস্মিকভাবে এর উচ্ছেদ করতে গেলে সাময়িক অসুবিধার সৃষ্টি হবে। তবুও এটি মুসলিম দেশে এই পাপাচার আর বরদাশ্‌ত করা যায় না। বর্তমানে বেশাবৃত্তি সমজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে এমনভাবে প্রবিষ্ট হচ্ছে অচিরেই এর প্রতিরোধ করা না গেলে সমগ্র সমাজকেই এ কুপ্রথা ও পাপাচার গ্রাস করে ফেলবে। আর হত্যা, রাহাজানি, গুণ্ডামি ও চৌর্যবৃত্তির সূতিকাগার হলো শহরের বেশ্যালয়গুলো। এগুলো যতদিন বহাল তবিয়তে থাকবে ততদিন দেশ থেকে অপরাধবৃত্তির উচ্ছেদ করে কার সাধ্য?

বেশ্যাবৃত্তি প্রতিরোধের জন্য আমাদের সমাজে এমন কোনো আইন নেই-যা দিয়ে শবমেহেরদের মত অসহায় গ্রামবালাকে রক্ষা করা যায়। আমরা মনে করি, বেশ্যাবৃত্তি নিষিদ্ধ করার মধ্যেই আজ হোক কাল হোক এর একটু প্রতিকার হবে। বেশ্যাবৃত্তি নিষিদ্ধ করে আইন প্রণীত হলে যেসব সামাজিক অসুবিধা দেখা দেবে, তা প্রতিরোধের জন্য আগে থেকেই প্রস্তুতি নিয়েই এগোতে হবে।

৬/৪/৮৫

www.pathagar.com

বেশ্যাবৃত্তির রকমফের

যে সামাজিক ব্যবস্থা অবশ্যম্ভাবী পতনের সম্মুখীন তার প্রধান ও পরিণত লক্ষণসমূহের একটি হল নারীর নিরাপত্তাহীনতা এবং একই সাথে সমাজে নির্লজ্জ, নিরাবরণ ও অবাধ বিচরণশীলা নারীর সংখ্যা বৃদ্ধি। এখানে আমরা বিধিবদ্ধ বেশ্যাবৃত্তির কথা উল্লেখ করিনি। বিধিবদ্ধ ও প্রকাশ্য বেশ্যাবৃত্তি আইন দ্বারা বন্ধ ও নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হলেও অপ্রকাশ্য বেশ্যাবৃত্তি অপ্রতিরোধ্য। ধনতান্ত্রিক সমাজে নারী হল পণ্য। নারীর রূপকেও মনোহারী দোকানের জিনিসের মত হাতে নিয়ে পরখ করে উল্টেপাল্টে পছন্দ করে কেনা যায়। বাংলাদেশকে আধা সামন্ততান্ত্রিক ও আধা পুঁজিবাদী দেশ হিসেবে অভিহিত করা হয়। এর সামাজিক অবক্ষয় বর্তমানে এক সীমাহীন বিকৃতির দিকে ধাবিত হয়েছে। এখানে নারী স্বাধীনতা, নারীশিক্ষা ও নারীর জীবিকা অর্জনের সমকক্ষতার কথা যতই বলা হোক না কেন, মেয়েরা বাংলাদেশে নিরাপদ সামাজিক জীব নয়। তাদের শরীর ও সতীত্ব রক্ষার জন্য বাংলাদেশের সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় রীতিনীতিকে সম্প্রতি আর যথেষ্ট বিবেচনা করা যাচ্ছে না। নারীর সতীত্বের ওপর হামলার যে সমস্ত খবরাখবর অহরহ সংবাদপত্রে প্রকাশিত হচ্ছে তা যদি কোনো সমাজবিজ্ঞানী নিবিষ্ট চিত্তে পাঠ করেন এবং এর অন্তর্নিহিত তাৎপর্য আবিষ্কারে গবেষণায় নিরত হন তবে চোখে অন্ধকার দেখা ছাড়া তার আর কোন গত্যন্তর আছে বলে মনে করি না।

সম্প্রতি বাংলাদেশের গ্রাম জনপদে নারী লাঞ্ছনার যে তরঙ্গ উঠেছে তা সামাজিক ও ধর্মীয় কারণেই এক ভয়াবহ দুশ্চিন্তার বিষয়। মনে হয় বিত্তহীন চাষী পরিবারের গৃহবধূরা, যুবতী ও কিশোরীরা শুধু নারী হওয়ার কারণেই যেন একশ্রেণীর লোকের চোখে অত্যন্ত সুলভ। তাদের সতীত্বের কোনো সামাজিক মূল্য আছে বলে তারা মনে করে না। এতদিন নারীর সতীত্বের ও শ্লীলতার ওপর হামলা সাধারণত শহরাঞ্চলেই সীমাবদ্ধ ছিল। দুয়েকটা ছিটেফোঁটা ঘটনা প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে ঘটলেও এর সুষ্ঠু সুবিচার ছিল সকলেরই স্বস্তি ও শান্তির কারণ। সম্প্রতি এই স্বস্তি ও শান্তি দারুণভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে। যদিও প্রশাসন ব্যবস্থা উপজেলা পর্যন্ত সম্প্রসারিত হয়েছে কিন্তু অবস্থাদৃষ্টে মনে হয় আইনের শিকড় গ্রাম পর্যন্ত পৌঁছলেও সুবিচার এখনও নদী পার হয়নি। সে পারঘাটে খেয়া নৌকার আশায় নিরুপায় হয়ে মাথা কুটছে।

প্রশাসন উপজেলা পর্যন্ত তার ডালপালা মেলাতে আমরা আনন্দিত। নিঃসন্দেহে এই পদক্ষেপ একটি বিপ্লবী পদক্ষেপ। তবে অনেক সময় বিপ্লব তেমন কোনো সুফল বয়ে আনে না যদি না এই বিপ্লবের সাথে সাধারণ মানুষের জন্য মঙ্গল ও সকল শ্রেণীর

www.pathagar.com

মানুষের জন্য সুবিচার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য সক্রিয় থাকে। প্রশাসন ব্যবস্থার প্রধান নির্ভরতা সৃষ্টি হয় জনগণকে নিরাপত্তা দানে। এই নিরাপত্তার আসল দাবীদার সাধারণ মানুষ ও গ্রাম জনপদের সহায়সম্বলহীন মানুষ যারা পরের জমিতে, পরের খামারে ও পরের ঘর-গেরস্থালীতে নিত্য শ্রমের বিনিময়ে নিজেদের ভরণ-পোষণ করে থাকে। প্রশাসন যদি হয় গ্রামের জুলুমবাজদের সহায়ক শক্তি তবে প্রশাসনিক বিপ্লবের পরিবর্তে উপজেলায় পচা প্রতিক্রিয়াশীলতার সম্প্রসারণই ঘটানো হবে।

আমরা অস্বীকার করি না উপজেলা পর্যন্ত প্রশাসন ব্যবস্থা এর হাত বাড়ানোর সাথে সাথে সারা বাংলাদেশ একটা নাড়া খেয়ে উঠেছে। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে ঔপনিবেশিক অবজ্ঞার ফলে বাংলাদেশের আসল ভিত্তিমূল আটষট্টি হাজার গ্রাম হকচকিয়ে গেছে। আশার বাতাসে সচকিত গ্রাম জনপদ। যেন কোটি কোটি নির্যাতিত মানুষ সমস্বরে চিৎকার করে উঠতে চায়, আমরা আমাদের ওপর হাজার হাজার বছর ধরে জমে থাকা অবিচার, অন্যায়-ক্ষুধা ও অবদমনের বিচার চাই। বিচার চাই লুণ্ঠন ও ধর্ষণের। বিচার চাই জমি বেহাত হওয়ার। বিচার চাই জাল দলিলের সাহায্যে ও গায়ের জোরে পেষণের কবলে ফেলে নিঃস্ব করে দেয়ার মত জুলুমের। যেদিন উপজেলা প্রশাসন ঐসব 'মোকদ্দমার' সত্যিকার সুবিচার প্রতিষ্ঠা করতে পারবে সেদিন শুরু হবে বিপ্লব। তখন বিপ্লবকে বিপ্লব বলে চিনতে অন্যের সাহায্য নিতে হবে না।

যা হোক একটি বিষয় আলোচনা করতে গিয়ে আমরা প্রসঙ্গান্তরে চলে গেছি। আমাদের আলোচ্য বিষয় ছিল বাংলাদেশের গ্রাম জনপদের বিত্তহীন পরিবারের নারী সমাজের নিরাপত্তাহীনতা। বর্তমানে বাংলাদেশের পল্লী প্রান্তরে নারীর সতীত্বের অসম্মান এক অসহনীয় পর্যায়ে উপনীত হয়েছে। যেখানে সেখানে নারী ধর্ষণ, শ্লীলতাহানি, হত্যা ও অঙ্গহানির জোয়ার বইছে। আমরা জানি এসব দুষ্কর্মের সবগুলোরই শেষ পর্যন্ত বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করাবার ক্ষমতা অত্যাচারিত শ্রেণীর সাধ্যের বাইরে। তবুও এর একটা বিহিত ব্যবস্থা সমাজের জন্য অপরিহার্য বলে আমরা মনে করি। আমার মনে করি সম্প্রসারিত প্রশাসন ব্যবস্থা আগুয়ান হয়ে নারীর সতীত্বের নিরাপত্তার গ্যারান্টি সৃষ্টি করতে পারলে সামাজিক ন্যায়নীতি যা এতদিন মোটামুটি প্রচলিত ছিল তা খানিকটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচবে। আগে গ্রাম্য বিচার বা গ্রাম প্রধানদের সালিশী গ্রাম্য সমাজকে যে নিরাপত্তা দিত তা এখন অবলুপ্তির পথে। প্রশাসন উপজেলা পর্যন্ত সম্প্রসারিত হওয়ায় ঐসব গ্রাম্য বিচার বর্তমানে উৎসাহহীন। তাছাড়া গ্রাম্য বিচার ব্যবস্থা ও নানা সামাজিক ও রাজনৈতিক কারণে স্বার্থপরতার পঙ্কে নিমজ্জিত। এদের প্রতি এখন আর সাধারণ মানুষের তেমন আস্থাও অবশিষ্ট আছে বলে মনে হয় না। এমতাবস্থায় অসহায়ের সহায় কে হবে?

সম্প্রতি জাতীয় সংবাদপত্রসমূহে প্রকাশিত নিম্নবিত্ত ও বিত্তহীন পরিবারের গৃহবধূদের জোরপূর্বক ধর্ষণের কয়েকটি খবরে বাংলাদেশের গ্রাম-সমাজের আভ্যন্তরীণ

www.pathagar.com

বিকৃতির একটা হৃদয়-বিদারক চিত্র চিন্তাশীল মানুষদের দারুণ অস্বস্তিকর অবস্থায় ফেলবে বলে আমরা আশঙ্কা করি। সংবাদগুলোর সারসংক্ষেপ করলে এই দাঁড়ায়- গাইবান্ধার উপজেলা পলাশবাড়ির রণবাসপুর গাঁয়ের গুলজার হোসেনের স্ত্রী নূরুননাহারকে কয়েকজন দুষ্কৃতকারী বাড়ী থেকে ডেকে নিয়ে জোরপূর্বক ধর্ষণ করে। লালমনিরহাট জেলার সাহাব পাড়ার দুলালী বেগম লাভলীকেও কয়েক ব্যক্তি জোরপূর্বক ধর্ষণ করে। আরেক দুলালী বারো বছরের মেয়ে, মিঠাপুকুর নিবাসী চাচার সাথে নবাবগঞ্জ যাওয়ার পথে কয়েক ব্যক্তির দ্বারা ধর্ষিতা হয়। তালা উপজেলার নালতা গ্রামের গৃহ-বধূ মরিয়ম বেগমকে এক ব্যক্তি স্ত্রীর অসুস্থতার জন্য সেবা করার ছলনা করে নিয়ে যাওয়ার সময় পথিমধ্যে আর কয়েকজনসহ শ্লীলতাহানি করে। পটুয়াখালীর পল্লীতে জৈনকাঠি গ্রামের মনোয়ারা বেগম স্বামীর বাড়ী থেকে বাপের বাড়ী যাওয়ার পথে তিন ব্যক্তির দ্বারা ধর্ষিতা হয়।

এই হল জোরপূর্বক গ্রাম বধূদের সতীত্বহানির পক্ষকালের সংক্ষিপ্ত সার। এ থেকেই বর্তমানে বাংলাদেশের আভ্যন্তরীণ সামাজিক বিকৃতির একটা সাদামাটা চিত্র পাওয়া যায়। এই চিত্রের সামগ্রিক ভয়াবহ দিকটা আরও কত মর্মান্তিক তা সহজেই আন্দাজ করা যায়।

আমরা মনে করি সামাজিকভাবে আমরা এক ভুল পথের যাত্রী। আধুনিক সামাজিক ব্যবস্থা যার বীজ পাশ্চাত্য অর্থাৎ ঔপনিবেশিক ও সাম্রাজ্যবাদী সমাজের ঐতিহ্যে লালিত তা ক্রমাগত আমাদের সমাজ তথা গ্রামের গভীরে প্রবেশ করে দেশকে ফতুর করে দিতে উদ্যত হয়েছে। আধুনিক শার্টপ্যান্টের মত তা আমাদের যুব মানসকে সম্পূর্ণভাবে বশীভূত করে ফেলেছে। ফলে দেখা দিয়েছে এক ধরনের অস্থিরতা। এই অস্থিরতার যেহেতু কোনো আদর্শ নেই, সে কারণে এর কোনো মূল্যবোধও থাকতে পারে না। ধর্মে এর মতি নেই। মানবিক দায়িত্ববোধের প্রতি নেই সম্মান। যার ফলে যুবমানস আজ উদ্দেশ্যবিহীন উন্নাসিকতায়, যৌনতায়, অপকৃষ্ট রুচিতে আকণ্ঠ নিমজ্জিত। আমাদের গ্রাম সমাজের শিকড় আগেই পচে গিয়েছিল। এখন বিলোপের আগে এর দুর্গন্ধে সকলের পক্ষেই তিষ্টানো দায়।

আমরা মনে করি এই অবস্থা থেকে দেশ, জাতি ও সমাজ কাঠামোকে রক্ষা করতে হলে ইসলামী নীতিবোধ আবার গ্রামে গ্রামে প্রতিষ্ঠা করতে হবে। আলেমদের সম্মানকে ফিরিয়ে আনতে হেব। প্রবর্তন করতে হবে ব্যাপকভাবে ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থার এবং পর্দার। পাশ্চাত্য সভ্যতায় ফতুর হয়ে সম্প্রতি মধ্যপ্রাচ্যের সবচেয়ে পাশ্চাত্য ঘেঁষা দেশও আবার পর্দার কথা চিন্তা করছে। নারীর সম্মান একমাত্র পর্দাই যে প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম একথা আজ সমস্ত বিরুদ্ধতার মুখেও উচ্চারণ করার নামই সম্ভবত জেহাদ। এই জেহাদ বাংলাদেশের কবে শুরু হবে?

২২/৪/৮৫

www.pathagar.com

বয়ঃসন্ধির পাশবিকতা

সংবাদপত্র খুললেই হত্যা, ছিনতাই, সড়ক দুর্ঘটনার কোনো কোনো সংবাদে পাঠকদের মেজাজটা ভারাক্রান্ত হয়ে থাকে, মনে হয় জিভের ওপর একটা অস্বস্তিকর তেতো স্বাদ কে যেন জোর করে ছড়িয়ে দিয়েছে। মানুষের প্রতি মানুষের স্বাভাবিক মানবিক মায়া-মমতার বন্ধন যদি না থাকে তখনই হতাশার কালো অন্ধকার দেশকে আচ্ছন্ন করে ফেলতে বাধ্য। এই অন্ধকারের বাসিন্দারাই অতিশয় সামান্য স্বার্থপরতার কারণে, যে কারণ স্বাভাবিক চিন্তা-চেতনার মানুষের কাছে অতিশয় তুচ্ছ, পরস্পরকে হত্যা করতে পারে। এমন কি অল্প বয়স্ক কিশোর তার কিশোরী সহপাঠিনীকে বাগে পেয়ে প্রেমে সাড়া না দেয়ার অপরাধে পাট ক্ষেতে দা দিয়ে কুপিয়ে হত্যা করতে পারে। পারে ব্যর্থ প্রেমিক তার নারাজ প্রেমিকার মুখে এসিড নিক্ষেপ করে তাকে চিরকালের মত পঙ্গু করে দিতে। এই সবি হল উপযুক্ত শিক্ষা ও রক্ষণাবেক্ষণের যথোপযুক্ত অভাবের দরুন একটি শিশুর মনে যে হতাশা ও পাশবিকতা দেখা দেয় তার বয়ঃসন্ধিকালীন আকস্মিক বহিঃপ্রকাশ। বাংলাদেশের কোন পরিবারই এখন এই মূল্য বোধের পতনের হাত থেকে প্রকৃত অর্থে মুক্ত নয়। একজন কিষাণ সন্তানের মধ্যে যে যে কর্তব্যবোধ শ্রমের প্রতি নিষ্ঠা ও পারিবারিক ঐতিহ্যের প্রতি দায়িত্ববোধ অবচেতন মনে একদা কাজ করতো আজ আর তা তেমন সতেজ নয়। একজন শিক্ষকের সন্তানের মধ্যে একদা লেখাপড়া, জ্ঞান ও বিদ্বানের প্রতি সম্মান দেখানোর যে অভ্যাস ছিল, অভ্যাস ছিল দেশ ও দশের প্রতি দায়িত্ববোধের, আজ তার চিহ্নমাত্র ঐ সমস্ত পরিবারের আচরণীয় বিষয় নয়। মূল্যবোধের অবক্ষয় কাকে যে কোথায় ছিটকে ফেলতে চাইছে, সামাজিক কোনো পরিবর্তন বা স্থিতিশীলতা যতক্ষণ পর্যন্ত সমাজ কাঠামোকে সুস্থির না করবে ততদিন বাংলাদেশের প্রতিটি প্রভাত আমাদের জন্য নিয়ে আসবে দুর্ঘটনার সংবাদ। চলতে থাকবে ছিনতাই, হত্যা,ধর্ষণ, লুণ্ঠন ও এসিড নিক্ষেপের ভয়ার্ত কাহিনী। আমরা বুকে হাত রেখে হৃৎপিণ্ডের ধুকপুকানি শুনতে শুনতে প্রায় প্রত্যহ তা পাঠ করতে করতে একদিন স্বাভাবিক হয়ে যাব।

গত পরশু সকালের পত্রিকার প্রথম পাতার অস্বস্তিকর সংবাদগুলোর মধ্যে দু'টি শিশুকে দু'টি মাত্র সোনার দুলের জন্য পানিতে চুবিয়ে হত্যার বিবরণ এতই হৃদয়বিদারক যে, অনিচ্ছায়, ভয়াবহ এক অস্বস্তির মধ্যে সংবাদটি পাঠ করে সারাটা দিন মনের ওপর একটা দুর্ভর চাপ নিয়ে নিজের কাজকর্ম করে গেছি। অনুভূতিশীল মানুষ প্রায় প্রত্যহই এ ধরনের মানসিক প্রেসারের মধ্যে জীবন কাটাতে বাধ্য হচ্ছে।

www.pathagar.com

আমাদের সব মূল্যবোধই যখন এক এক করে পাল্টে যাচ্ছে, তখনও কিন্তু কয়েকটি কুসংস্কার পাল্টায়নি। যেমন সোনার অলংকার ধারণ। উজ্জ্বল ধাতু হিসাবে সোনাকে অত্যধিক মূল্য দেয়া। বিয়ে-শাদীতে সোনাকে লেনদেনের বিষয় হিসাবে বিবেচনা করা ইত্যাদি। পৃথিবীতে কোথাও এই উপমহাদেশের মত সোনার অলংকার পরার রেওয়াজ নেই। অতীতে থাকলেও এখন উঠে গেছে। ইউরোপ-আমেরিকায় কোনো নারীই সোনার অলংকারকে তার রূপ সৌন্দর্যের সহযোগী মনে করেন না। তারা যে কোনো উজ্জ্বল কমদামের ধাতুর গয়নাতেই সন্তুষ্ট। সোনা যেহেতু সব সময় শয়তানের লালসা-লোভকেই চাঙ্গা করে তোলে; তাছাড়া দামী ধাতু বয়ে বেড়ানো চিরকালই বিপজ্জক সে কারণে পাশ্চাত্যের বুদ্ধিমতী নারীরা বহু আগেই সোনাকে অলংকার ধাতু হিসেবে পরিত্যাগ করেছে। পাথরের, লোহার, নিকেলের অলংকারই বর্তমানে শ্বেতাঙ্গিনীদের শোভা বৃদ্ধির সহায়ক শক্তি হিসাবে পরিগণিত।

বাংলাদেশে সোনা প্রতি মুহূর্তে নানাবিধ অঘটনের কারণ বা জন্মদাত্রী। প্রায় প্রত্যহই বেআইনীভাবে বিদেশ থেকে সোনা আনার ঘটনা পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। চোরাপথে মধ্যপ্রাচ্য থেকে সোনা আনতে গিয়ে কাস্টমের হাতে ধরা পড়ার সচিত্র খবর দেখে দেখে ভাবি, এই ধরা পড়ার জন্য যে পাচারকারীরা খুব বিব্রত তা মনে হয় না। আমাদের কাছে যা লক্ষ লক্ষ টাকার ব্যাপার, পাচারকারীদের কাছে তা কিছুই নয়। এ যেন এক ধরনের অবজ্ঞাপ্রসূত ব্যাপার। তা না হলে গত কয়েক মাসে বিমানবন্দরে কাস্টমস যে তাল তাল সোনার বেআইনী আমদানী হাতেনাতে ধরলো, তাতে কি গোল্ড স্মাগলিং বন্ধ হয়েছে বলে মনে হয়? আমাদের তো তা মনে হয় না। মনে হয় সোনার যে কুসংস্কার সারাটা দেশকে আষ্টে-পৃষ্ঠে বেঁধে রেখেছে তা যতদিন উপশম না হবে ততদিন সোনার মূল্য কমবে না।

সোনা ছাড়া বিয়ে হয় না। আগেই জেনে নিতে হয়, কনের শরীরে কত ভরি সোনা সেঁটে দেওয়া হয়েছে। জড়োয়া যে সব সময় মানুষের শরীরকে সুন্দর করে তোলে এমন কোনো কথা নয়, তবুও বাংলাদেশের প্রতিটি মেয়ে ভাবে, স্বপ্ন দেখে তার গা ভরা গয়না। অধিকাংশ মেয়েকেই যে সোনার গয়নায় কুৎসিত দেখায় এটা কুসংস্কারের জন্য কেউ বলতে পারে না। যদিও আর্থিক কারণে সবাই আশ মিটিয়ে সোনার অলংকার পরতে পারে না, তবুও সোনার কোনো কিছু পেলেই তা শরীরে ধারণ করার একটা জঘন্য অভ্যেস বাঙালী নারীরা আজও ত্যাগ করতে পারেনি। অবশ্য শহর অঞ্চলে দু'একটি পাশ্চাত্য শিক্ষিত পরিবার থেকে সোনার অলংকারের অভ্যেস একটু একটু উঠে যাচ্ছে বলে মনে হয়।

গত পরশু সংবাদপত্রে দু'টি শিশু হত্যার ঘটনার বলা হয়েছে, খুলনার খালিশপুরের এক গৃহ পরিচারিকা এক আনা ওজনের কানের দুলের জন্য পাশের বাড়ীর এক ভদ্রলোকের মেয়ে ও নাতনীকে, যাদের বয়স মাত্র চার কিম্বা পাঁচ পানিতে চুবিয়ে

www.pathagar.com

হত্যা করে। এই হত্যার নির্মমতা ও ভয়াবহতার দিকে আমরা দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলতে চাই, একটি শিশুর কানের একবিন্দু দুলই দু'টি শিশুর অকালে জীবননাশের কারণ হল। যদি এক আনা সোনার এই দুলটি মেয়েটির কানে না থাকতো তবে সম্ভবত দুটি অমূল্য প্রাণের এমন অসহায় অবসান দেশবাসীর দেখতে হত না।

যে পরিচারিকাটি মেরিনা ও সুমি নামের শিশু দুটিকে চরম নির্মমতার সাথে দুটি এক আনা সোনার দুলের জন্য হত্যা করেছে তার নাম হালিমা। হালিমা বিধবা, তারও সুমি ও মেরিনার মত চার পাঁচ বছরের দু'টি মেয়ে আছে। সোনার লোভ যে সর্বনাশ করেছে তা অবর্ণনীয়। যদি হালিমা সুমি ও মেরিনার কাছ থেকে সাবধানে দুল দুটি অপহরণ করতে পারতো তবে সৃষ্টি হত অন্য দৃশ্যের। বঞ্চিত এক বিধবার সন্তানের কানে হয়ত এই এক আনা সোনার দুল দুটি দুলতো। হালিমার মাতৃহৃদয় এতে পরিতৃপ্ত হতো। দৈব তাকে সেই সুযোগ থেকে বঞ্চিত করে অদৃশ্য শয়তানের হাতে সঁপে দিয়েছে। যার প্রভাব অর্থাৎ অবৈধ লোভে সে প্রতিবেশীর পরিচিত দু'টি বাচ্চাকে নাম বলে দেবে এই ভয়ে হত্যা করতে দ্বিধা করেনি। হায়রে সোনার দুল!

আমরা বিষয়টির মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে আর যেতে চাই না। তবে সোনার প্রতি এ দেশের মানুষের একটা কুসংস্কারজনিত ব্যাধি নিয়ে দু'চার কথা বলতে চাই। সোনা খুব মূল্যবান ধাতু বলেই এটা বিপজ্জনক। এ ধাতুর অলংকার নিরাপদে ঘরে রাখা যায় না। গলায় পরে একা একা বিচরণ করা যায় না। অন্যকে ধার দিয়ে ব্যবহার করতে দিয়েও স্বস্তি নেই। এ এক নিত্য দুশ্চিন্তার ব্যাপার। এ ধরনের ধাতু বা অলংকারের প্রতি ইসলামের কোন সমর্থন নেই। সোনা স্তূপীকৃত করার বিরুদ্ধে ইসলামে কঠোর নিষেধবাণী উচ্চারিত হয়েছে। মোট কথা, সোনার ব্যাপক ব্যবহারের ব্যাপারে ইসলাম মানুষকে মূলত আমার বিবেচনায় নিরুৎসাহ করতে চায়। পুরুষ মানুষকে তো সোনার আংটি পর্যন্ত ব্যবহার করতে নিষেধ করা হয়েছে।

আমাদের ধর্ম সোনার ব্যবহারকে উৎসাহ দেয়নি। এই দিকটির প্রতি নজর রেখে দেশ থেকে সোনার অলংকার ব্যবহারের ব্যাপক প্রচলনের বিরুদ্ধে নৈতিক আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। যদি অলংকার হিসেবে সোনার প্রচলন ও ব্যবহারকে নিরুৎসাহ করা সম্ভবপর হয়, তবে কত যে অঘটন, ডাকাতি, রাহাজানী ও হত্যাকাণ্ডের হাত থেকে মানুষ রেহাই পাবে এর ইয়ত্তা নেই।

১৫/৬/৮৫

www.pathagar.com

বাঁচতে হলে বেচতে হবে?

আমাদের দেশে মেয়েদের চাকুরী ক্ষেত্রে, বিভিন্ন পেশায় পেশাজীবী হিসেবে এবং কলকারখানা-ফ্যাক্টরী ইত্যাদিতে শ্রমিক হিসেবে ব্যাপক আগমনের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। এর মধ্যেই যে কয়েকজন মহিলার চাকুরী জুটেছে কিংবা যে কয়জন নারীর শ্রমিক হিসেবে কার্যক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়তে দেখা যাচ্ছে, সেখানে তাদের আর্থিক সুবিধা-অসুবিধা কি, পুরুষের মধ্যে চলাফেরায় স্বাচ্ছন্দ-সচ্ছলতা কেমন কিম্বা সেকেণ্ড সেক্স হিসেবে তাদের মান-ইজ্জতের গ্যারান্টি কতটা রক্ষিত হয় এর বিস্তারিত বিবরণ আমাদের অজানা। তবে পত্র-পত্রিকায় কর্মজীবী নারীদের যেসব অসুবিধা-অপমানের কথা প্রকাশিত হয় তাতে দেশবাসী তেমন গা করেন না এই ভেবে যে, প্রথম প্রথম একটু-আধটু অসুবিধা তো হবেই। ধনতান্ত্রিক আধুনিক নগরজীবনে অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতায় বাঙালি মুসলিম যুবতীদের আকস্মিক প্রবেশে সামাজিক ও পারিবারিক ঘূর্ণিঝড় তো উঠবেই। তা বলে মেয়েরা তো আর এযুগে ঘরের ভেতরে হাত গুটিয়ে বসে থাকতে পারে না। বেঁচে থাকার লড়াইয়ে নামতে হলে পর্দা পোশিদা বা ঠুনকো মান-ইজ্জতের কথা ভাবলে কি চলে? বাঁচাটাই বড় কথা। বাঁচতে হলে বেচতে হবে। সে পণ্য শ্রমই হোক অথবা শ্রম কম হলে তথা শ্রমের ঘাটতি হলে অন্য কিছুই হোক তাতে কার কি আসে যায়? পুঁজিবাদী সমাজের গোড়ার কথা হল আপনার বেচার মত কিছু আছে কিনা? যদি আপনার বেচার মত কিছু না থাকে তবে আপনার কোন দাম নেই। যার দাম নেই, এই সমাজে তার জীবনধারণের দায়িত্ব কে নেবে? কেউ নেবে না।

এই পরিস্থিতিতে পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থায় সবচেয়ে লাঞ্ছিত জনসমষ্টির নাম নারী সমাজ। আর এই নারী সমাজের মধ্যে সবচেয়ে অপমানকর অবস্থা হল মুসলিম মেয়েদের। কারণ নারীর সম্ভ্রম রক্ষায় ইসলাম যে সাবধানতা প্রয়োগ করেছে পুঁজিবাদী সমাজে তা মেনে চলা এক অসম্ভব ব্যাপার। তবুও বিশ্বব্যাপী মুসলিম নারীরা তাদের সম্ভ্রম ও শালীনতা রক্ষার জন্য অপসৃয়মান সামন্ততন্ত্র থেকে শুরু করে আজকের ধনতন্ত্রের নিমজ্জমান গোধূলি বেলায়ও তাদের সংগ্রাম অব্যাহত রেখেছেন। তাদের স্বপ্নের মধ্যে রয়েছে এক ইসলামী বিপ্লবের যুগ। সে যুগের সমস্ত লক্ষণ যখন পতনোন্মুখ বিশ্ব ব্যবস্থায় প্রতিভাত হচ্ছে তখন ধৈর্যধারণই উত্তম। এর মধ্যেই মুসলিম মাতা বধূদের ইজ্জতের সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে। শ্রম বেচেই বাঁচতে হবে - ইজ্জত-হুরমত বিকিয়ে দিয়ে নয়।

পারিবারিক অভাব ও অসহনীয় আর্থিক দুর্গতিই বাংলাদেশের মেয়েদের

www.pathagar.com

কলকারখানা ও ফ্যাক্টরীসমূহে টেনে আনছে। এর আগে আমাদের শ্রমজীবী মেয়েরা ঘরের কোণে বেকার বসেছিলেন এটা যেন কেউ না ভাবেন। যারা নারী স্বাধীনতার কথা বলেন, তারা পারিবারিক শ্রমকে অর্থাৎ ঘরের ভেতরের জীবনব্যাপী পরিশ্রমকে হিসেবে না ধরেই বাইরের কর্মক্ষেত্রের একটা সুরাহার কথা বলেন। বর্তমান পরিস্থিতিতে এর প্রয়োজন মেনেই আমরা বলতে চাই, এটা হল বাংলাদেশের মেয়েদের জন্য দৈনিক আরও আট ঘন্টার অর্থনৈতিক লড়াই। পুঁজিবাদী সমাজের নীতিজ্ঞানহীন পুরুষদের স্ত্রী বা কন্যা হওয়ার খেসারত ইসলামী শালীনতাবোধ ও শ্রমনীতি একদিন নিশ্চয়ই নারীকে এই নির্মম পেষণ থেকে মুক্তি দেবে। তার আগে মুসলিম মাতা-বধূদের অবশ্যই ইজ্জত-রক্ষার সংগ্রামের মন্ত্র বুকে নিয়েই বাইরের কলে-কারখানায় এবং ফ্যাক্টরীতে আসা-যাওয়া করতে হবে।

যেমন তারা কিছুকাল আগেও বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে শস্যের বিশাল প্রান্তরসমূহে স্বামী-পুত্রের সাহায্যার্থ প্রাণপাত খাটুনিকে হাসিমুখে বরণ করে নিতেন। তখনও যেমন তারা ঘরে-বাইরে পারিবারিক সচ্ছলতার জন্য খেটে স্বামী-পুত্রের মুখে উষ্ণ অন্ন তুলে দিতেন, আজও তাকে একই আদর্শে শহর-নগরে আধুনিক কর্মক্ষেত্রে তা পালন করতে হবে। অতীতেও গ্রামের মেয়েরা ঘরের বাইরে এসে পুরুষের পাশাপাশি দাঁড়িয়ে কঠোর পরিশ্রম করেছেন। আজও যে করছেন না, এমন নয়। সেই সব পরিশ্রমী মা-বোনেরা তখন বোরকা পরে খেতের কাজ করতে যেতেন এমন কথা যেমন কেউ বলবে না, তেমনি কর্মক্ষেত্রে তারা বেপর্দা থাকতেন একথাও কারো বলার সাহস আছে বলে মনে করি না। কারণ এক অদৃশ্য শালীন মনোভাব ও লজ্জাশীল ভঙ্গীই ঐসব মুসলিম মা-বোনদের এক অদৃশ্য কিন্তু অলংঘনীয় পর্দায় আবৃত রাখতো। আজও রাখে। ভবিষ্যতেও রাখবে। আল্লাহ চান তো চিরকালই তা থাকবে।

কিন্তু শহরের জীবন হল অন্য রকম জীবন। এখানে শ্রমজীবী নারীদের প্রধান সমস্যা হল ব্যক্তিগত আড়ালের সমস্যা। যারা কলকারখানায় নারীদের আজকাল নিয়োগ দিচ্ছে, তারা যে তা দয়াপরবশ হয়ে দিচ্ছে এটা ঠিক নয়। কম মজুরীতে অধিক মুনাফার লোভেই তারা নারী শ্রমিক নিয়োগ করছে। নারীদের প্রতি তাদের বিশেষ কোনো প্রকার দয়ামায়া নেই। অল্প পয়সায় শ্রম পাচ্ছে বলেই গার্মেন্টস ফ্যাক্টরীগুলো অল্প শিক্ষিত, অর্ধ শিক্ষিত কিংবা অশিক্ষিত মেয়েদের ব্যাপকহারে পুরুষ শ্রমিকদের জায়গায় বসিয়ে দিচ্ছে। একে তো সুবিধা-অসুবিধা, দৈনিক মজুরীর হার ইত্যাদি নিয়ে পুরুষদের মত মেয়েরা প্রতিবাদমুখর নয়। দ্বিতীয়ত মেয়েদের স্বভাব-সুলভ লজ্জা শরমের কারণে তাদের খাটানো যায় বেশী। মেয়েদের প্রতি ফ্যাক্টরী মালিকদের অনুগ্রহ নয় বরং অল্প মজুরীতে প্রতিবাদহীন পরিশ্রমের অভ্যেসই তাদের এ কাজের যোগ্য করে তুলেছে। ঐ সমস্ত গার্মেন্টস ফ্যাক্টরী গড়ে ওঠার আগে এই মেয়েরাই হয়তো মধ্যবিত্ত শহুরে পরিবারগুলোতে ঝি চাকরের কাজ করতো। সেই জীবনের নামমাত্র বেতনে হাড়ভাঙ্গা খাটুনির অভিজ্ঞতা,মান-ইজ্জতের ভয়, গৃহকর্ত্রীদের নির্মম আচরণের অকথিত বেদনা বুকে নিয়েই মেয়ে শ্রমিকরা গার্মেন্টসে এসেছে। এখানে তারা প্রথম লাভ করেছে একটু সুনির্দিষ্ট পারিশ্রমিকের ন্যূনতম গ্যারান্টি। সুনির্দিষ্ট কাজের সময় ও অতিরিক্ত

www.pathagar.com

কাজের জন্য ওভার টাইমের সুযোগ এবং দিনান্তের কাজের পর নিজেদের অভিভাবকদের কাছে ফিরে গিয়ে নিরাপদে রাত্রি যাপনের স্বাধীনতা। এই স্বাধীনতা বাংলাদেশের নারী শ্রমিকের জন্য যে কতবড় অগ্রগতি তা বলাই বাহুল্য।

এই সাফল্য বাংলাদেশের শ্রমের ইতিহাসকে খানিকটা হলেও প্রসারিত করেছে। অসংখ্য মেয়ে যারা কাজের অভাবে গ্রামাঞ্চলে ও শহরের বস্তি এলাকায় ধুঁকে ধুঁকে মরছিল কিংবা বাঁচার কোনো পথ দেখতে না পেয়ে শুধুমাত্র পেটের দায়ে অসম্মানজনক পথে পা বাড়াচ্ছিল তা কিছু পরিমাণ হলেও স্তিমিত হয়েছে। তাছাড়া কর্মসংস্থান মেয়েদের জীবন সংগ্রামে সাহসী করে তুলেছে। এখন তারা তাদের নিজেদের শ্রমের মূল্য, নিজের পায়ে দাঁড়াবার আত্মবিশ্বাসে বলীয়ান। এ বিশ্বাস এখন সহজে মচকাবার নয়। আমরা যদিও মুসলিম যুবতীদের পারিবারিক আওতায় ও তাদের যোগ্য কাজে নিয়োগ দানেরই পক্ষপাতী। তবুও দেশের সার্বিক পরিস্থিতি ও আবহাওয়ার কথা বিবেচনা করে এর বিরূপ সমালোচনার পক্ষপাতী নই। তবে বর্তমান অবস্থায় নারী শ্রমিকদের নিয়ে কিংবা পেশাজীবী মহিলাদের নিয়ে কোনো কোনো কর্তৃপক্ষের আচরণের সমালোচনা না করে পারছি না।

আজকাল পত্রপত্রিকায় দেখা যাচ্ছে যে, কোনো কোনো পোশাক নির্মাণ কারখানায় নাকি ওভারটাইমের অছিলায় সন্ধ্যার পরও অধিক রাত পর্যন্ত মেয়েদের কর্মক্ষেত্রে আটকে রাখা হয়। তাদের অভিভাবকগণ উদ্বেগাকুল চিত্তে তাদের ঘরে ফেরার অপেক্ষা করতে থাকেন। কেউ কেউ আবার উৎকণ্ঠা নিয়ে মেয়েদের কর্মক্ষেত্রের বারান্দায় বসে থাকেন। কখন মেয়েটি নিরাপদে বেরুতে পারবে সর্বদা সেই দুশ্চিন্তা।

সম্প্রতি ঢাকা শহরের সামাজিক পরিস্থিতি যে পর্যায়ে উপনীত হয়েছে তাতে কোনো মেয়েই স্বাধীনভাবে চলাফেরাকে দিনের বেলাতেই নিরাপদ ভাবতে পারেন না। এমন কি স্কুল কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীদের ওপর একশ্রেণীর দুষ্কৃতকারীর অহরহ হামলার যে ধারাবাহিক বিবরণ প্রতিনিয়ত সংবাদপত্র ও অন্যান্য প্রচার মাধ্যম প্রচার করছে তাতে একজন শ্রমিক নারীর নিরাপত্তার গ্যারান্টি কি?

আমরা মনে করি বাংলাদেশে গার্মেন্টিস ফ্যাক্টরীগুলো বর্তমানের টলটলায়মান অবস্থা থেকে যতই দৃঢ় অর্থনৈতিক ভিত্তির ওপর দাঁড়াতে পারবে ততই তাদের আসল চেহারা বেরিয়ে পড়বে। সম্প্রতি তা বেরিয়েও পড়েছে। এমতাবস্থায় তাদের কাছ থেকে নারী শ্রমিকদের নিরাপত্তার খাতিরে কিছু গ্যারান্টি আদায় করা উচিত। যেমন কোন মেয়েকে সন্ধ্যার পর ওভারটাইমের অছিলায় আটকে রাখা যাবে না। তাছাড়া যে সব গার্মেন্টিস ফ্যাক্টরীতে মেয়েরা কাজ করছেন তাদের জন্য কিছু মেয়েলী সুযোগ-সুবিধা, আড়াল, বাথরুমের আলাদা ব্যবস্থা ইত্যাদির সুরাহা করে দিতে হবে।

তা ছাড়া, বাংলাদেশ একটি মুসলিম দেশ। এখানকার নারী শ্রমিকদের সামাজিক শালীনতার বোধ অন্যান্য প্রতিবেশী দেশের সাথে তুলনীয় নয়। অবশ্যই তাদের পৃথক ধরনের নিরাপত্তার গ্যারান্টি থাকতে হবে এবং প্রয়োজনবোধে এই নিরাপত্তার জন্য আইনের সমর্থন ও নতুন আইন সৃষ্টি করতে হবে।

১৭/৮/৮৫

www.pathagar.com

প্রাণধারণের গ্লানি

বিশ্বব্যাপী মানবজাতির নৈতিকতার মান অধঃপতনের চরমসীমায় উপনীত হয়েছে বলে আশংকা করা হয়। আমরা আমাদের দেশের তরুণ-তরুণীদের উদ্দাম আচরণ নিয়ে প্রায়শই আলোচনা করে থাকি। তরুণ সমাজের মধ্যে অবৈধ যৌনাকাংখার প্রসার, জোরপূর্বক নারীত্বের অবমাননা, লুণ্ঠন, ধর্ষণ ও হত্যায় আমাদের প্রতিটি প্রভাত মেঘাচ্ছন্ন। এমন একটাও প্রভাতের সাথে আমাদের সাক্ষাৎ হচ্ছে না যাতে আমাদের জন্য প্রাত্যহিক সংবাদপত্রগুলো কোনো স্বস্তির সংবাদ নিয়ে এসেছে। নিজের সন্তান থেকে শুরু করে দেশের শ্রেষ্ঠ সন্তান যারা, তারাও আজ জাতির কাছে কোনো নির্ভরতার দৃষ্টান্ত স্থাপনে ব্যর্থ। এই হল সেই ভয়াবহ সময় যখন মানুষ নিজের অতীত কৃতিত্বের ওপরও আর ভরসা রাখতে পারছে না। ক্রমাগত আপোস ও মানবতার অবমাননার মধ্যে আমাদের বাঁচতে হচ্ছে। একেই সম্ভবত বলা হয় প্রাণ ধারণের গ্লানি।

আমরা মানি, এই গ্লানি বাংলাদেশের একার নয়। সারা পৃথিবীতেই ছড়িয়ে পড়েছে এর ব্যাপকতা। আর পৃথিবীর বিশাল মানচিত্রে বাংলাদেশ একটা অনুল্লেখযোগ্য বিন্দু হিসেবেই বিবেচিত হবে। যদিও আমাদের কাছে তা আমাদের স্পন্দিত হৃৎপিণ্ডের মতই আপন। তবুও আমাদের নিয়ে বিশ্ববাসীর মাথাব্যথা থাকার কোনো কথা নয়। নেইও।

আমাদের সমস্যা যেভাবেই হোক, আমাদেরকেই সমাধান করতে হবে। আমরা যেমন দুর্যোগ দুর্বিপাকে বিশ্বের সাহায্যের জন্য হা করে তাকিয়ে থাকি। তেমনি নৈতিক অধঃপতনের ব্যাপারেও সম্ভবত আমাদের অবচেতন মন পরমুখাপেক্ষী। তা নাহলে আমাদের চোখের সামনে আমাদের সংসার, পারিবারিক বন্ধন ও ভয়ভক্তি ধুলোয় গড়াগড়ি যাচ্ছে, আমরা এর কি প্রতিকার করতে পারছি? অথচ এর প্রতিবিধান যে অসম্ভব নয়, তা সমাজবির্বতনের ইতিহাসে ধর্মীয় ইতিহাসের ধারাবাহিকতায় ভুরি ভুরি দৃষ্টান্ত ছড়িয়ে রেখেছে।

আমরা মানি, কঠোরতম দণ্ড দানের বিধান অপরাধ প্রবণতাকে উল্লেখযোগ্য হারে কমাতে পারে। কমাতে পারে তবে নিশ্চিহ্ন করতে পারে না। আমরা যদিও কঠোরতম দণ্ড দানেরই পক্ষপাতী, তবুও কিশোর-কিশোরীদের অবৈধ যৌনাকাংখা নির্মম শাস্তিতে নিবৃত্ত হবে এই মতে নির্জলা বিশ্বাস রাখতে পারি না। আমরা মনে করি এর অন্য দাওয়াই আছে। সেই প্রতিষেধক প্রয়োগ না করা পর্যন্ত নৈতিক পতন রোধ করা যাবে না। বলাবাহুল্য, সেই ওষুধের নাম ধর্মচেতনা অর্থাৎ পাপ পুণ্যের ভয়।

www.pathagar.com

গত এক দশক ধরে বেড়ে ওঠা বাংলাদেশের কিশোর-কিশোরীরা শিক্ষাক্ষেত্র থেকে যে জিনিস অর্জন করেনি এর নাম ধর্মবোধ বা নৈতিকতার শিক্ষা। আল্লাহ্ যে আছেন, তিনি যে মানুষের পাপপুণ্যের বিচারক, পরকাল যে সত্য, সেই জীবনই যে অনন্ত জীবন এই কথা শিক্ষা দেয়ার মত কোনো ব্যবস্থা আমাদের বিদ্যাপীঠগুলোতে আজকাল আর নেই। ফলে বয়োসন্ধির সদাসদ চিন্তা অন্তর্হিত। জ্ঞানই এখন আমাদের শিক্ষা কেন্দ্রের চরম উদ্দেশ্য।

অন্যদিকে যে সব সাংস্কৃতিক আনন্দের ক্ষেত্রগুলোতে কিশোরগণ বেশী আকৃষ্ট সেখানেও ধর্মচেতনা একটা সেকেলে পরিত্যাজ্য বিষয় হিসাবেই বিবেচিত হয়। যেখান থেকে ধর্মচেতনা ও আদর্শবাদ নিশ্চিহ্ন হয়েছে সে সমাজ একটা পচা কেকের মত। চাকচিক্যের মাখন লাগিয়ে এর গলন আর কতদিন ঠেকিয়ে রাখা যাবে? এখন সময় এসেছে একে ফেলে দেবার। পরিত্যাগ করার। যে খাদ্য কোন প্রাণীরই ভোগে লাগে না তা আস্তাকুঁড়ে ফেলে দিয়ে মাটি চাপা না দিলে নতুন আহার্য প্রস্তুত করা যাবে না।

আমাদের কিশোর সমাজের নৈতিকতা বিনাশের আর একটি প্রধান কারণ হল আইনের প্রয়োগে পক্ষপাত। এই দেশে একটি শ্রেণী আছে যাদের সন্তানদের কোনো জঘন্য অপরাধেরও শাস্তি হয় না। তারা স্কুলে ছাত্রীদের বিরক্ত করে। পথে রাহাজানি করে। বর্তমানে এদের সাহস এতদূর বিস্তৃত হয়েছে তারা নারী ধর্ষণের মত অপরাধ করেও রেহাই পেয়ে যায়। আইন এদের পাকড়াও করলেও, শুনেছি ওপরের দিকের একটি টেলিফোনই এদের ছাড়ানোর জন্য যথেষ্ট। এরা এমন লোকের সন্তান যাদের পিতারা চিরকাল দেশবাসী জনগণের সাথে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে ক্ষমতার আসনে উপবিষ্ট হয়েছে। যখন যে সরকার আসে তারা তাদেরই সমর্থক এবং সংগঠক। সমাজে কত উত্থান পতন হয়ে যায় অনেক মানুষ সেই উত্থান পতনে হারিয়ে যায়। কিন্তু এরা এদের নির্লজ্জ হাসিটি নিয়ে ঠিকই থাকে। মোসাহেবরা এদের কাছেই সুবিধা লোটার জন্য ছোটাছুটি করে। মানুষ ভাবে এবার হয়ত এদের উচ্ছেদ হবে কিন্তু পাটপরিবর্তনের ধোঁয়া সরে গেলে দেখা যায় গোলযোগের অস্পষ্টতার ভেতর এদেরই কুৎসিত মুখচ্ছবি। এদের সকলেই চেনে কিন্তু কেউ কিছু করতে পারে না। এদের ছেলেমেয়েরাই অপরাধ করে শাস্তি এড়াতে পারে। এদের জন্য কোনো আইন নেই, আদালত নেই, জেলখানা নেই।

এরাই জাতির প্রতিবাদ এবং প্রতিরোধের মেরুদণ্ড ভেঙে দিচ্ছে। আগে পাড়ায় একটি অসামাজিক কাণ্ড ঘটে গেলে পাড়ার লোকেরাই সম্মিলিতভাবে এর প্রতিরোধ করতো। প্রতিবিধান হত এমন চমৎকার যে পাড়ার লোকেরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচতো। আর আজ অপরাধী মাস্তানগণই হল পাড়ার বিচারক। ভালো মন্দের জন্য তাদেরই শরণাপন্ন হতে হয়। তাদের সাথেই উচ্চমহলের যোগাযোগ থাকে। এ সমাজে নিরপরাধ ভালো মানুষের কোনো জায়গা নেই।

www.pathagar.com

আমাদের সন্তানদের ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচাতে হলে তাদের অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ করতে শেখাতে হবে; যা কিছু ন্যায় ও সুবিচারের পক্ষে তারই সপক্ষে আত্মোৎসর্গ করতে শেখাতে হবে। ন্যায়ের পক্ষে সাহসের সাথে প্রাণদানে উৎসাহ দিতে হবে। একেই বলে প্রতিরোধ। অন্য কোন মৌখিক প্রতিরোধে কোন কাজ হবে বলে মনে হয় না। আদর্শের কথা মুখে আওড়ালে কি হয়? কিচ্ছু হয় না। অন্তত বাংলাদেশে হওয়ার সম্ভাবনা নেই।

আমরা আগেই বলেছি, কোনো ফাঁকা আদর্শবাদ নয়। ধর্মচেতনাই কিশোর মনকে নৈতিক বলে বলীয়ান করে তুলতে পারে। দেশের সাংস্কৃতিক প্রচারের মাধ্যমগুলোর যে অবস্থা এতে সাংস্কৃতিক চেতনার উদ্বুদ্ধ করে নৈতিকমান উন্নত করার আর আশা নেই। কারণ সাংস্কৃতিক মাধ্যমগুলো বর্তমানে যাদের পরিচালানাধীন তাদের মধ্যে দেশের বৃহত্তম ধর্ম ইসলামী চেতনা ও ইসলামী মূল্যবোধের বালাই নেই। সংস্কৃতি বলতে তারা ভারসাম্যহীন নৃত্যগীতিকেই প্রধান বিষয় বলে ধরে নিয়েছেন। অথচ আমরা মনে করি জাতীয় সংস্কৃতি অবশ্যই জাতীয় ধর্মের বিধি-নিষেধ অর্থাৎ পাপ পুণ্যের সীমারেখার মধ্যে আবর্তিত রাখতে হবে। ধর্মবোধহীন আমলা, সংস্কৃতিকর্মী ও শিল্পীর উৎসাধনই সাংস্কৃতিক মূল্যবোধকে আবার স্বক্ষেত্রে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করতে পারে। তারা লষ্ট জেনারেশন। মৃতকল্প প্রতিভু। সাংস্কৃতিক নেতৃত্বের দুরূহ কাজ থেকে এদের এখন বিদায় নেবার কাল এগিয়ে এসেছে। এ দায়িত্ব নিতে অন্যদের এগিয়ে আসতে হবে যাদের আছে ধর্মীয় সদাসদ চিন্তা। আছে আধ্যাত্মিক জ্ঞান।

আমাদের দেশে এ ধরনের জ্ঞানের অধিকারী কেবলমাত্র জ্ঞানে ও চরিত্রে ইসলামের অনুসারী মানুষরাই। এরা ছাড়া আল্লার ভয়ে অধিকতর ভীত আর কেউ নেই। আর চিরকাল গ্রামে গঞ্জে হাটে-মাঠে আমাদের সাধারণ মানুষের মধ্যে পাপ পুণ্যের বোধ প্রতিষ্ঠায় আলেম সমাজের কোনো বিকল্প নেই। বর্তমান নৈতিক দুর্যোগ মুহূর্তে আলেমগণই পারেন তাদের দরস ও বক্তৃতার মাধ্যমে দেশের তরুণ-তরুণীদের মধ্যে নৈতিক মূল্যবোধ ফিরিয়ে আনতে।

আজ যদি আধুনিক প্রচার মাধ্যমগুলোতে বাধাহীনভাবে অর্থাৎ সব প্রতিবন্ধক দূর করে দেশের প্রখ্যাত ধর্মীয় ব্যক্তিত্বকে তরুণ-তরুণীদের আহবান করার শক্তি ও সুযোগ দেওয়া হয়। আমরা মনে করি, এর যাদুকরী প্রভাব সমাজকে উৎফুল্ল করে তুলবে। ফিরে আসবে অন্যায় ও পাপের বিরুদ্ধে সত্যিকার প্রতিরোধ। কিন্তু এসব কথার কোন মূল্য কে দেবেন?

১/৯/৮৫

www.pathagar.com

বুদ্ধিজীবীদের ভারসাম্যহীনতা

বাংলাদেশের নাগরিক জীবনের সবচেয়ে বিব্রতকর অবস্থা সম্ভবত আমাদের বুদ্ধিজীবীদের প্রকাশ্য মতামতের ভারসাম্যহীনতা। কে যে কখন কি বলবেন কখন কোন অবস্থাকে সমর্থন করে বিবৃতি ঝাড়বেন এর কোন স্থিরতা নেই। তারা প্রকাশ্যে নারী ধর্ষণ, ছিনতাই, নারী নির্যাতন ও অশ্লীলতাকে সমর্থন করেন না। এসব ঘটনার সাম্প্রতিক আধিক্যে পুলিশ প্রশাসনকে দোষারোপ করছেন। আবার এখানে সেখানে নাগরিক প্রেমকুঞ্জগুলোতে -যার গালভরা নাম হল বিনোদন কেন্দ্র-নর-নারীর অবাধ মেলামেশায় পুলিশের হস্তক্ষেপে দারুণ আতংকগ্রস্ত হয়ে পড়েছেন। তারা মানতে চান না যে, সেখানে পুলিশের হস্তক্ষেপ সঠিক হয়েছে। কারণ সম্প্রতি কোনো এক লেকের পাড়ের ঘটনায় যারা ধরা পড়েছিলেন তারা ভদ্রবেশধারী। তারা পর-পুরুষের সাথে ঢলাঢলি করলেও তাদের সামাজিক সম্মানে সম্মানিত স্বামী বা অভিভাবক আছে। কেউবা অবিবাহিত তরুণী আবার কেউ কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী। এমতাবস্থায় বুদ্ধিজীবীদের ঘাবড়াবারই কথা। কারণই বিবৃতি ঝেড়ে বলা হচ্ছে যে পুলিশ ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলাদের অবাধ মেলামেশার যে কেন্দ্রকে আমরা বিনোদন ক্ষেত্র বলি সেখানে প্রবেশ করতে পারবে না। পুলিশ প্রবেশ করবে শুধু দরিদ্র শ্রেণীর নর-নারীর অবৈধ দুষ্কর্মের মধ্যে। পুলিশ কেন ভদ্রলোকদের রুচিশীল নর্মলীলায় নাক গলাবে?

আমরা বুদ্ধিজীবীদের এসব মতামতের সাথে ঐকমত্য প্রকাশ করতে সম্পূর্ণ অক্ষম হয়ে পুলিশ প্রশাসনকে দ্বিধাহীনচিত্তে সমর্তন জানাতে এই নিবন্ধের সূচনা করছি। আমরা লেকের পাড়ের ঘটনার মত ঘটনায় পুলিশের হস্তক্ষেপকে সমাজ-রাষ্ট্র ও ধর্মের স্বার্থে একান্ত জরুরী বলে মনে করি। সমাজে সম্প্রতিকালে অশ্লীলতার যে তরঙ্গ উঠেছে তা রোধ করতে পুলিশ প্রশাসনকে জলে-স্থলে-অন্তরীক্ষে সর্বত্র সশস্ত্রভাবে পদচারণা করার সুযোগ দিতে হবে। গ্রেফতার, আটক ও প্রকাশের অধিকার দিতে হবে। একজন সমাজবিরোধী পুরুষ বা নারী যেমন অবৈধ মেলা-মেশার জন্য পুলিশ প্রশাসন-সংবাদপত্র ও সমাজের কাছে উন্মুক্ত হয়ে যায়, তেমনি একজন ভদ্রঘরের বধূ যদি তার অধিকার বহির্ভূত পরপুরুষের সাথে ভদ্রলোকদের রুচিশীল বিনোদন কেন্দ্রে বা নগরের বিতানসমূহে অথবা যে কোনো লেকের পাড়ে গভীর রাতে নিভৃতচর্চা করে তবে ধর্মীয় দৃষ্টিতে তা অনধিকার চর্চার শামিল বলে গণ্য করতে হবে। এবং এ ধরনের মেলামেশার প্রতি পুলিশ চক্ষু মুদে বসে থাকতে পারে না।

পুলিশ প্রশাসনকে সমাজে শ্রেণী বৈপরীত্যের দরুন দু'রকম আচরণ করতে যারা

www.pathagar.com

উৎসাহ যোগায় তারা পশ্চিমা পচা ও ঘুণেধরা সমাজ সভ্যতার দালাল। এরা নারী স্বাধীনতার কথা মুখে বললেও নারীকে ভোগ্যপণ্যের চেয়ে বেশী কিছু মনে করেন না। তারা চান নগরে কয়েকটি প্রেমকুঞ্জ থাকবে, এখানে তরুণ-তরুণীরা অবাধে মেলামেশা প্রেমালাপ ও নিভৃতচর্চা করবে। এই নিভৃতচর্চা যদি সীমা ছাড়িয়েও যায় তবুও যেহেতু ঘটনাগুলো তথাকথিত রুচিশীল কেন্দ্রে ঘটেছে তাতে প্রশাসনের হস্তক্ষেপের প্রয়োজন নেই।

আমরা এ ধরনের দৃষ্টিভঙ্গীর বিরোধিতা না করে পারি না। আমরা মনে করি, বাংলাদেশ বিশ্বের একটি অন্যতম মুসলিম অধ্যুসিত অঞ্চল। এখানকার শ্লীল-অশ্লীলতার সীমা সরহদ সম্পূর্ণ আলাদা। পাশ্চাত্যের নারী স্বাধীনতার দৃষ্টিভঙ্গী ও মুসলিম সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে যে মৌলিক পার্থক্য রয়েছে তা অস্বীকার করে আমাদের সামাজিক শৃঙ্খলা ভেঙে পড়তে দিতে পারি না। আমাদের দেশবাসীও তা চাইবেন না। দেশের তথাকথিত কয়েকজন মুষ্টিমেয় লোক তারা যে কোনো বুদ্ধিবৃত্তিকেই তাদের জীবনাদর্শনের উপজীব্য করুন না কেন, যা সামাজিক সংঘর্ষের সূচনা করে তা পরিত্যাজ।

এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে বাংলাদেশে শুধু মুসলিম সম্প্রদায়ের নর-নারীই বসবাস করেন না, হিন্দু বৌদ্ধ খৃষ্টান সম্প্রদায়ের নাগরিকগণও বসবাস করেন। তাদের সমাজে যদি অবাধ মেলামেশার সুযোগ থাকে তবে কোন যুক্তিতে তা প্রতিহত করা হবে?

আমরা মনে করি যুক্তি হল জনসংখ্যার গুরুত্বের এবং দেশাচারের। দেশের পনর আনা যেখানে মুসলমান সেখানে ইসলামী বিধান ও শরিয়তের বিধিনিষেধকে অবজ্ঞা করে চলা বিজ্ঞতার পরিচয় নয়। আর একান্তই যদি সংখ্যালঘুদের অধিকারের জন্য নর-নারীর অবাধ মেলামেশার জন্য বিনোদন কেন্দ্রের প্রয়োজন হয় তবে সেখানে সাইন বোর্ড ঝুলিয়ে দিতে হবে যে, এই কেন্দ্রটি কেবল অমুসলিম যুবক যুবতীদের বিনোদন ক্ষেত্র। এ ধরনের ব্যবস্থা গৃহীত হলে পুলিশও সহসা প্রবেশ করে কাউকে গ্রেফতার কিংবা কাউকে আটক করবে না।

আর তা যদি না হয়। যদি মুসলমান সম্প্রদায়ের মত দেশের সকল নাগরিকগণের সামাজিক মূল্যবোধের চেতনা একই রকম ভালো-মন্দের ওপর প্রতিষ্ঠিত রাখতে হয় তবে অবাধ প্রেমের ক্ষেত্রগুলোতে পুলিশের হস্তক্ষেপের অহরহ প্রয়োজন। কারণ দেশে যেভাবে নারীর ওপর হামলা চলছে যেভাবে সামাজিক নির্ভরতা ভেঙে যাচ্ছে তাতে সরকারী প্রশাসনকে অযথা দোষী করে লাভ নেই।

আমরা এক দিকে প্রগতিশীলতার নামে নারীকে সম্পূর্ণ উদোম করে ফেলে বিপরীত লিঙ্গের অধিকারীকে সংযত ও সভ্য থাকার উপদেশ খয়রাত করতে পারি না। যেসব পাশ্চাত্য দেশে শতাব্দীব্যাপী নারীরা স্বাধীন সেসব দেশেও দেখা গেছে মাত্র এক ঘন্টার জন্য নৈশকালীন বৈদ্যুতিক আলো বিপর্যস্ত হলে ঐ সমস্ত মহানগরী মুহূর্তের মধ্যে

www.pathagar.com

মহা অরণ্যে পর্যবসিত হয়। ব্যাপকভাবে নারীরা ধর্ষিত হয়। দোকানপাট লুণ্ঠিত হয় এবং খুন জখম মাত্রা ছাড়িয়ে যায়।

আল্লাহর ভয়হীন মানব সমাজ যে শেষ পর্যন্ত পশুত্বের স্তরকে অতিক্রম করতে পারে না এর বহু প্রমাণ পাশ্চাত্যের সমাজ বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার ও উপলব্ধি করে আজ এক স্তম্ভিত অবস্থায় উপনীত হয়েছেন। এ ব্যাপারে নতুন কোনো পরীক্ষার জন্যে বাংলাদেশের মত পশ্চাৎপদ মুসলিম দেশকে বেছে না নিলেও চলে। অশ্লীলতার গর্ভে অশ্লীলতাই জন্মলাভ করবে।

আমরা নর-নারীর স্বাভাবিক সম্পর্ককে অস্বীকার করি না। যুবক-যুবতীরা পরস্পরকে ভালো বাসবে না। এমন কথা কোনো ধর্ম বা নীতিশাস্ত্রই বলে না। তবে প্রকৃত প্রেমের স্বার্থেই এর একটা স্বাভাবিক সীমারেখা ইসলাম নির্ধারণ করে দিয়েছে। কারণ প্রেমের নামে যুগ যুগ ধরে নারীকে ভ্রষ্ট চরিত্রের লোকেরা যেভাবে প্রতারণা করেছে তাতে নারীত্বের মর্যাদা ধূলায় লুণ্ঠিত হয়েছে। কত নারী হারিয়ে ফেলেছে মানসিক ভারসাম্য। কত নরীকে আশ্রয় নিতে হয়েছে মানবেতর জীবন প্রণালীতে তার হিসেব কে রাখে?

আমরা এ দেশের মুসলিম জনগণ কোনো উন্মুক্ত প্রেমকেন্দ্রে বিশ্বাসী নই। প্রেমের কোনো প্রকাশ্য প্রদর্শন ক্ষেত্র থাকা উচিত বলে আমরা মনে করি না। মূলত আমরা এদেশের যুবক-যুবতীদের অবাধ মেলামেশায় আস্থাশীল নই। পৃথিবীতে বর্তমানে ইসলামী পুনর্জাগরণের একটা প্রত্যক্ষ তরঙ্গ বইছে। এ তরঙ্গের স্পর্শ আমদের দেশের আবহাওয়াতেও প্রবেশ করছে। ইসলামের শত্রুরা তা বুঝতে পেরেই যুবক যুবতীদের বিপথে চালিত করতে উঠে পড়ে লেগেছে। চতুর্দিকে, নাটক সিনেমায় টেলিভিশনে নর নারীর বিকৃত সম্পর্কের জয়গানকে তাই আকাশ ছাপিয়ে তোলার চেষ্টা চলছে। এরই পরিনামে একটি ষোল বছরের ছেলেও তাই দেখা যায় নারী ধর্ষণের মত ভয়াবহ পাপে লিপ্ত হতে দ্বিধাবোধ করে না।

ঢাকা একটি প্রাচীন মুসলিম শহর। এর সমৃদ্ধি ও সভ্যতার একটি অতীত ইতিহাস আছে। কলকাতার মতো বৃটিশ ও বেনেদের লোভ লালসা ও শোষণের ইট দিয়ে গড়া শহর নয় ঢাকা। এখানে অসংখ্য মসজিদের আজানাধ্বনির মধ্যে মানুষের ঘুম ভাঙে। আবার বিচিত্র কণ্ঠের অসংখ্য মোয়াজ্জিমের আজানধ্বনির মধ্যে রাত্রি নেমে আসে। এই শহরে নর-নারীর অবৈধ মেলামেশার কোনো আইনানুগ সুযোগ থাকা মুসলিম জনগণের কাম্য নয়।

১৪/৯/৮৫

www.pathagar.com

চিন্তাচর্চার শূন্যগর্ভ ইমারত

বাংলাদেশের শিল্পী, সাহিত্যিকদের মধ্যে বর্তমানে চিন্তার ও মানবিক দিগ্দর্শনের এক অন্ধকারাচ্ছন্ন নৈরাজ্য বিরাজ করছে। কারো সামনে ভবিষ্যতের কোনো সুস্পষ্ট চিত্র নেই। ধর্মের প্রতি যেমন তাদের সন্দেহ তেমনি ধর্মহীনতার সাম্প্রতিক অনাচার দেখে তারা দারুণভাবে আতংকগ্রস্ত। তরুণদের বিশেষ করে ছাত্র-ছাত্রীদের নৈতিক অধঃপতনেও তারা সমান দিশেহারা। এ অবস্থায় কোনো দেশেই যাকে বলে সত্যিকার জ্ঞানের চর্চা তা চলতে পারে না। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো বর্তমানে শিক্ষক সমাজের উদ্দেশ্যহীন চিন্তাচর্চার শূন্যগর্ভ ইমারতে পরিণত হয়েছে। কিছুদিন আগেও এসব ক্ষেত্রে তথাকথিত প্রগতিশীল মতবাদ মার্কসবাদ, অস্তিত্ববাদ ও মানবতাবাদের বাগাড়ম্বর শোনা যেত। বর্তমানে এসব মতবাদও এক দুর্বোধ্য হতাশায় নিমজ্জিত। এসব মতবাদের পরস্পর বিরোধী ঘাত-প্রতিঘাতে আমাদের শিক্ষক সমাজ যেমন ক্লান্ত, তেমনি ছাত্র সমাজও দেশের মাটি ও মানুষের সাথে সম্পর্কহীন। মানবরচিত নীতি-সমূহের বিশ্বব্যাপী ব্যর্থতায় হতাশ। এমতাবস্থায় দেহগত আনন্দ, নগ্নতা ও অশ্লীলতায় তরুণমন পরিতৃপ্তি খুঁজবে এতে আর সন্দেহ কি? ফলে আমাদের সর্বপ্রকার মৌলিক নির্মাণ বা রচনার ক্ষেত্রে এখন নর-নারীর দেহগত সম্পর্ক এক প্রধান বিষয় হয়ে উঠেছে। চিত্রকলা, কাব্যকলা বা সাহিত্যে এখন এমন এক পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে যা কেবল কামসুখ তথা নিকৃষ্ট রসেরই যোগানদার। এ ধরনের সাংস্কৃতিক পূর্বাভাস হল একটা জাতির সাংস্কৃতিক দেউলিয়াপনার ও অন্তসারশূন্য চিন্তা-চেতনার লক্ষণাক্রান্ত। আমরা বাংলাদেশী মুসলমান জনগোষ্ঠী কি তবে চরম অধঃপতনের অতলে তলিয়ে যাচ্ছি?

এ ধরনের প্রশ্ন আমার মনে জেগেছে কয়েকদিন আগে একজন তরুণ লেখক ও তার নিত্যসঙ্গী (স্ত্রী নয়) তরুণীর সাথে কথা বলে। তারা সামাজিক বা ধর্মীয় কোনো কু-প্রথা (?) মানেন না। আবার ঠিক নাস্তিকও তাদের বলা যাবে না। কারণ আল্লাহ সম্বন্ধে এদের ধারণা হল একজন সৃষ্টিকর্তা তো নিশ্চয়ই আছেন, ইত্যাদি। তবে ইসলাম সম্বন্ধে তাদের বিরূপতার অন্ত নেই। পর্দা প্রথা ও নারীদের অধিকার ইত্যাদি প্রসঙ্গে তারা ইসলামী নীতিমালাকে বস্তাপচা ও প্রতিক্রিয়াশীল নীতিমালা বলে মনে করেন। যত অনাচারই ঘটুক না কেন পাশ্চাত্য জীবনপদ্ধতিই তাদের কাছে বেশী কাম্য। তারা সাহিত্য-সংস্কৃতির প্রসঙ্গ উঠলে শ্লীল-অশ্লীলতার সীমা মানতে চান না। মহিলাদের ব্যক্তিগত আবরণ, মাতৃত্বের দায়িত্ব ও পারিবারিক রক্ষণশীলতার কথা তো তাদের

www.pathagar.com

কাছে তোলাই গেল না। এসব প্রসঙ্গকে নিতান্ত হাসির ব্যাপার বলে হো হো করে উড়িয়ে দিলেন। তারপর একের পর এক পাশ্চাত্যের গণতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় নারীর অবস্থান সম্পর্কে কয়েকটি মূল্যবান উদাহরণ দিতে থাকলেন। আমি ইসলামী জীবনব্যবস্থার অনুসারী জেনেই তারা আমাকে হাস্যকর অবস্থায় ফেলার জন্য ঐসব উদাহরণ জড়ো করছিলেন।

আমি অত্যন্ত ধৈর্য সহকারে এই তরুণ লেখক ও তার প্রগতিশীল সঙ্গিনীর দৃষ্টান্ত সমূহ শুনলাম। সন্দেহ নেই, তারা যে সব যুক্তি দিলেন তা সহজে অগ্রাহ্য করা যায় না। তবে এসব যুক্তিও যে বহু পুরানো এবং আজকাল বস্তাপচা তা আমি কথার ফাঁকে একবার উল্লেখ করতে ছাড়িনি। এখানে তার ঐসব অসার যুক্তির অবতারণা করে এই নিবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি করতে চাই না। শুধু এটুকু বললেই যথেষ্ট যে, পাশ্চাত্যের নারীরা আজ অর্থনৈতিক স্বয়ম্ভরতার এমন এক স্তরে আছে যেখানে পুরুষের পীড়ন তাদের স্পর্শ করতে পারে না। এ হল এদের মত।

আমি ইউরোপীয় নগরজীবনে নারীর অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে যৌন অনাচারের কয়েকটি গ্রন্থবদ্ধ দৃষ্টান্ত দিলে তরুণ লেখক ও তার অত্যাধুনিক সঙ্গিনী একটু ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেলেন। আমি জ্যাঁ পল সাত্রেল আজীবন সঙ্গিনী (বিবাহিত স্ত্রী নন) মাদাম সিমন দ্য বোভোয়ারের মেমর্স অফ এ ডিউটিফুল ডটার থেকে লেখিকা হিসাবে রাতের পারী নগরীতে তার অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করলাম। অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের মারাত্মক পরিণতি অর্থাৎ কয়েকজন যৌনকাতর পুরুষের হাত থেকে তিনি শেষ পর্যন্ত কিভাবে আত্মরক্ষা করলেন সেই বর্ণনা দিয়ে আমি ইউরোপীয় মানসিকতায় নারীর প্রতি দৃষ্টিভঙ্গির আসল তথ্যের আঘাতে তাদের যুক্তিকে খণ্ডন করলাম।

আমার কথায় উভয়েই যখন হতবাক আমি তখন অতিথিদের জন্য চায়ের অর্ডার দিলাম। আমার ধারণা ছিল তারা আমার আপ্যায়ন প্রত্যাখ্যান করে উঠে পড়বেন। কিন্তু আশ্চর্য তারা চা এলে আগ্রহের সাথে চায়ে চুমুক দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, ইসলামে নারীর অধিকার সম্বন্ধে পর্দা ও অন্যান্য পারিবারিক বিষয় সম্বন্ধে কি কি কথা আছে? আমি যখন জানলাম এই তরুণ-তরুণী জীবনের কোনো অবসরেই একবারের জন্যও ভালো করে পবিত্র কোরান পাঠ করেননি, তখন আমার বিস্ময়ের অবধি রইল না। আমি তাদের আল্লাহর কিতাব অন্তত একবার অর্থ ও ব্যাখাসহ পাঠ করে দেখার অনুরোধ জানালাম এবং সন্দেহ সাথে প্রায় সবগুলো হাদিসগ্রন্থ একটু চেখে দেখতে পরামর্শ দিলাম। তারা আনন্দিত মনেই উঠে গেলেন। জানি না, আমার পরামর্শ তাদের কোনো কাজে লাগবে কিনা। তবে সুপরামর্শ দিতে পেরে আমি নিজে অত্যন্ত আনন্দবোধ করলাম।

এই হল, আমাদের দেশে যেসব তরুণ বুদ্ধিজীবী ইসলামের বিরোধিতা করেন তাদের অবস্থা। তাদের অধিকাংশই জীবনে অন্তত একটি বারের জন্যও নিজেদেরই ঘরে

www.pathagar.com

রাখা আল্লাহর কিতাব পাঠ পর্যন্ত করেননি। আথচ অবিরাম এর বিরোধিতার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রাবস্থায় তার কোনো কসুর করেন না।

আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিক নৈরাজ্যের আর একটি প্রধান কারণ হল স্রোতের টানে অজ্ঞের মত ভেসে যাওয়া। সবাই বলছে আমিও বলি –ভাবটা এরকম। সব দেখে আমার এ বিশ্বাস দৃঢ় হচ্ছে যে, যারা আমাদের দেশে ইসলামের বিরোধিতা করেন তাদের একটা বৃহত্তর অংশ ইসলাম সম্বন্ধে প্রকৃত তথ্য না জেনেই এর বিরোধিথা করেন। আমাদের মধ্যবিত্ত সমাজে কয়টি পরিবার পাওয়া যাবে যারা নিজেদের মধ্যে অথবা নিজের সন্তানদের তাগাদা দিয়েছেন অন্তত জীবনে একবার পবিত্র কোরান পাঠ করে দেখতে?

আমাদের অধিকাংশ তরুণ কবি-সাহিত্যিকই বিশ্বসাহিত্য ও বিভিন্ন জাতির প্রাচীন পুরাণ ও ইতিহাস পাঠ করতে আগ্রহী। হাতের কাছে পেলে তারা সেসব আস্বাদনও করে থাকেন। তারা ভাবেন এই জানাটা তাদের মৌলিক রচনায় মাঝে মধ্যে উপমা হিসেবে আসতে পারে। আসেও। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়, এদেশের অধিকাংশ তরুণ কবিই নিজের ধর্মগ্রন্থ ও ইসলামের প্রকৃত ইতিহাস সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অন্ধকারে থাকেন। তারা ইসলামের বিরোধিতা করেন অথচ পবিত্র কোরান হাদিস হাতের কাছে থাকা সত্ত্বেও তা পাঠ করে দেখতে অগ্রসর হন না।

২২/৯/৮৫

www.pathagar.com

বিনষ্টির মহানির্দেশ

ইউরোপ-আমেরিকা সর্বদিকেই মানবতা বিরোধী অপরাধ প্রবণতার সর্বশেষ সীমায় উপনীত হয়েছে বলে মনে হয়। সমকামিতা, অপ্রাপ্ত বয়স্ক শিশুদের ওপর যৌন হামলা, অত্যাধক মাদক দ্রব্য সেবন, বিকৃত যৌন লালসা চরিতার্থ করার জন্য ঠাণ্ডা মাথায় খুন। ব্যাপক ভাবে তৃতীয় বিশ্ব যুদ্ধের প্রস্তুতি পর্ব যথা পারমাণবিক অস্ত্র নির্মাণ ও জমা করে রাখা, অর্ধেকটা গোলার্থ জুড়ে শুধু পারমাণবিক চুল্লী অহোরাত্র জালিয়ে রেখে প্রতিদ্বন্দ্বী জাতিগুলোর বিনাশ-চিন্তার উত্তেজক আবহাওয়ার মধ্যে কাল কাটানো। এই হল বর্তমান বিশ্বে সভ্য মানুষের বসবাসের অঞ্চল ইউরোপ ও আমেরিকার সর্বশেষ পরিণামের প্রকৃত খবর। কিছুদিন আগে লিবিয়াকে ঠাণ্ডা করার জন্য আমেরিকান বিমান হামলা যে প্রকৃতপক্ষে বিশ্বের শক্তিমদমত্ত একটি পারমাণবিক দাম্ভিক অঞ্চলের আস্ফালন মাত্র তা আজকাল বিশ্বের বিবেকসম্পন্ন মানুষ স্বীকার করে নিয়েছে। ফলে লিবিয়ার কর্মপদ্ধতির প্রতি কারো সমর্থন থাকুক না থাকুক, তারা লিবিয়াকে অন্যায়ভাবে আক্রান্ত একটি নির্যাতিত দেশ মনে করছে এবং অদৃশ্যভাবে নিজেরই অজ্ঞাতে সমর্থন জানাতে শুরু করেছে।

মনে হচ্ছে, পাশ্চাত্য জগত অর্থাৎ পারমাণবিক শক্তিধর জাতিগুলোর মধ্যে আল্লাহর গজবের মত একটা উন্মত্ততা ও নির্বুদ্ধিতা নেমে এসেছে। তাদের কথা ও কাজের মধ্যে সৃষ্টি হচ্ছে বৈপরীত্য। তারা পরস্পরকে এমন সব অপরাধমূলক কাজে সমর্থন জানাচ্ছে যা সুস্থ মানবমন কিছুতেই সমর্থন জানাতে পারে না। যেমন লিবিয়ার ওপর আক্রমণে বৃটেনের আমেরিকাকে নিজের উপায়-উপকরণ দিয়ে সমর্থন।

যেমন চেরনোবিলের ভয়াবহ পারমাণবিক দুর্ঘটনাকে একটি সামান্য ঘটনা হিসাবে বিশ্ববাসীকে ধোঁকা দেয়ার রুশ চেষ্টা। অথচ ঘটনাটা সামান্য তো নই, বরং এর ক্ষতিকর পরিণাম ভবিষ্যতে কতদূর পর্যন্ত গড়াবে তাও হলফ কর কেউ বলতে পারে না। পরিবেশ, আবহাওয়া, বায়ুমণ্ডল ও মেঘের চলাচলের মধ্যে কি পরিমাণ তেজস্ক্রিয় বিকিরণ মানুষ, পশু-পাখি, উদ্ভিদরাজি ইত্যাদি প্রাণশক্তির কতটা ক্ষতি করবে তা বিশেষজ্ঞদেরও সমীক্ষার বাইরে বলে ধারণা করা হচ্ছে। কেউ জানে না, পারমাণবিক বিকিরণক্রিয়া চেরনোবিল থেকে উত্থিত হয়ে ইউরোপ তথা বিশ্বের প্রাণবান জীবসমূহ ও প্রাণীর আহার্য যে উদ্ভিদ, ফল-মূল ও দুধের প্রস্রবণে কি পরিমাণ বিপদ লুকিয়ে রেখেছে। এই বিপদ শেষ পর্যন্ত মানবজাতির অস্তিত্বকেই বিপন্ন করবে কিনা। শুধু মৃত্যুর আতংক ছড়িয়ে পড়েছে চেরনোবিলের সন্নিহিত ইউরোপের অন্যান্য জাতিগুলো মধ্যে। যে জাতিগুলো অর্থনৈতিকভাবে ফোলা-ফাঁপা দেখা গেলেও, নৈতিক বা

www.pathagar.com

আধ্যাত্মিক দিক দিয়ে দেউলিয়া। যৌন-সর্বস্ব। পারিবারিকভাবে অসুখী। নাস্তিক। সামাজিকভাবে বিধ্বস্ত ও বিপন্ন।

তবে কি অতিশয় মন্থর গতিতে পৃথিবী নামক গ্রহটি কিয়ামতের মাহবিনাশের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে? শুরু হয়েছে কি মৃদু গতিতে বিনষ্টির মহা নির্দেশ? ফেরেশতা ইস্রাফিল কি তার শিংগাটিতে সর্বশক্তিতে ফুঁ দিবার আগে একবার পলকের মধ্যে ঠোঁট চেটে নিচ্ছেন? আমরা জানি না। তবে এক ধরনের অলৌকিক উৎসাদন যে শুরু হয়েছে তার লক্ষণ ও দৃষ্টান্তসমূহ ছড়িয়ে আছে চতুর্দিকে।

আর ছড়িয়ে আছে সেই পাপ, যে পাপে সদোম ও ঘমোরা নামক দুটি মহানগরী নগরবাসীদের সমকামিতার মত বিকৃত যৌন আচরণের জন্য সম্পূর্ণ বিনাশপ্রাপ্ত ও ইতিহাসের ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। মানবসমাজ যখনই এর প্রকৃতিগত স্বাভাবিক খাসলত পরিত্যাগ করে পাশবিক আচরণ শুরু করে, তখনই নেমে আসে ধ্বংস। আজ গ্রীক, রোমান ও পারস্য সভ্যতা বিনাশের যে কারণগুলো গবেষকগণ আবিষ্কার করেছেন এর প্রধান কারণ যে যৌন শিথিলতা বা নির্বিচার যৌন স্বাধীনতার কালিমার নীচে ঢাকা পড়ে আছে তা সকলেরই জানা।

আজ আবার ইউরোপের কয়েকটি দেশে যৌন অনাচার এমন সীমা ছাড়িয়ে গেছে যে, ভাবি, এদের পাপে আল্লাহর আক্রোশ না এমন পর্যায়ে উপনীত হয়, যাতে সারা পৃথিবীই এক প্রাণশূন্য বালু বেলায় পরিণত হয়? এই যে আকস্মিকভাবে পারমাণবিক দুর্ঘটনাটি ঘটে ইউরোপের একটা বৃহৎ অঞ্চলকে পারমাণবিক তেজস্ক্রিয় বিকিরণ ক্রিয়ার ভয় ধরিয়ে দিয়েছে। যাতে বাজারে মাছ-মাংস, ফলমূল, শাকসবজির পাহাড় জমে গেলেও ভয়ে কেউ কিনতে সাহসী হচ্ছে না। কারণ ঐ সব খাদ্যদ্রব্যে তেজস্ক্রিয়া বিকিরণের ভয়ের ভূত প্রবেশ করে সকলকে এক অস্বস্তিকর আজাবের মধ্যে রেখেছে।

আমরা মনে করি, এ ধরনের পারমাণবিক দুর্ঘটনা হলো গায়েব থেকে মানবজাতি তথা ইউরোপ ও আমেরিকার সর্বগ্রাসী সাম্রাজ্যবাদী, সামাজিক সাম্রাজ্যবাদী ও আধিপত্যবাদী শক্তিগুলোর প্রতি কিয়ামতপূর্ব সতর্ক সংকেত। আমরা জানি, আমাদের একথা শুনে এ দেশের তথাকথিত আঁতেলেকচুয়ালগণ হেসে গড়াগড়ি যাবেন। কিন্তু চেরনোবিল পারমাণবিক দুর্ঘটনা বিজ্ঞান-মনস্ক মানুষ মাত্রেরই বুকের ভেতর কাঁপন ধরিয়ে দিয়ে জ্বলে উঠেছে। তিনি আস্তিক হোন বা নাস্তিকই হোন, সার্বিক বিনাশের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে যারা মানবজাতির অস্তিত্ব রক্ষার জয়গান গাইতে চান, তাদের পক্ষে আমাদের কথায় হেসে ওঠা সম্ভব নয়। সম্ভব শুধু নির্ভাবন উন্মাদের পক্ষে।

ইউরোপীয় তথা পাশ্চাত্য পারিবারিক ব্যবস্থা বহুকাল যাবতই একটা মরা শূকরের মত ভাগাড়ে পচে উঠেছে। এর পচনের প্রধান কারণ হল যৌন স্বেচ্ছাচারিতা। যৌন তৃপ্তির অস্বস্তিকর উপায় অবলম্বন। শিশু ও বৃদ্ধের প্রতি অবজ্ঞা। ক্ষণস্থায়ী যৌবন-কালকে ধরে রাখার নির্বোধ চেষ্টায় হাস্যকর উত্তেজক মাদকের এবং ব্যবহার নগ্নতা ও অশ্লীলতাকে চিরস্থায়ী করার জন্য পোশাকে অদ্ভুত ছাঁটকাটের ব্যবহার। অবশেষে

www.pathagar.com

সম্পূর্ণ উলঙ্গ হওয়ার আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়া, ইত্যাদি। এ ধরনের একটি জগতকে আল্লাহ অতীতে কখনো দীর্ঘস্থায়ী করেননি। যদি করেও থাকেন তবে করেছেন তাদেরই অস্তিত্বের চিহ্ন সম্বলিত মহানগরগুলোর ধ্বংসস্তূপের ইটপাথরেরই স্থায়িত্ববিধান।

আজ আবার ইউরোপের কয়েকটি দেশের নৈতিকতার জঘন্য কুৎসিত কদর্যতা আমাদের সামনে সংবাদের আকারে উৎঘাটিত হয়েছে। একই সাথে এসেছে চেরনোবিলের ভয়াবহ দুর্ঘটনার আতংকের খবর। আপাতদৃষ্টিতে এই দুটি ঘটনার মধ্য কোনো সংযোগসূত্র আবিষ্কার করা না গেলেও অতীতের আদ ও সামুদ জাতির বিনাশের দৃষ্টান্ত থেকে আমরা জানি যৌন অপরাধেই আসলে অলৌকিকভাবে প্রাচীন নগর, শহর ও জনপদগুলো বিধ্বস্ত হয়েছে। বেবিলনের বিনাশের কারণ কি ঘরে ঘরে যৌন দুষ্কৃতির প্রসারের প্রতিফল নয়? হারুত ও মারুত নামক ফেরেশতার অধঃপাতের ইঙ্গিত থেকেই পবিত্র কোরআন আমাদের জানিয়ে দেয়, কি পরিমাণ অজাচার, অশ্লীলতা ও যৌনপাপ বিশ্ব নগরসমূহের রাণী বেবিলনকে কুরে কুরে খাচ্ছিল। লুত নবী (আঃ) সামুদকে রক্ষার শেষ চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু যেখানে একটি মহানগরীর সমস্ত পুরুষ মানুষই সমকামিতার ভয়াবহ রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়ে, সেখানে সে জাতির উৎসাদন ছাড়া সর্বশক্তিমান আল্লাহর আর কি করার ছিল?

আমরা সকলেই জানি, বৃটিশ জাতির লীলাভূমি লণ্ডন মহানগরী মানবসভ্যতার আদান-প্রদান ও সংরক্ষণের এক তীর্থক্ষেত্র রূপে আধুনিক মানুষের কাছে বিবেচিত হয়। যদিও বৃটিশ জাতি তাদের অতীতের সব গৌরবই হারিয়ে ফেলেছে তবুও তাদের গণতন্ত্রের প্রতি নিষ্ঠা ও শিল্প-সংস্কৃতির সংরক্ষক হিসেবে এখনও খানিকটা সুনাম অবশিষ্ট আছে। উপনিবেশগুলো হারিয়ে ঠুঁটো জগন্নাথ হয়ে থাকলেও, ইংরেজরা এখনও সুবিধা ও সমর্থন পেলে যে এশিয়া-আফ্রিকার পরিত্যক্ত জমিদারীগুলোয় ঝাঁপিয়ে পড়তে উৎসাহী তা সম্প্রতি আমেরিকার লিবিয়া হামলাকালে থেচারের সাফাই থেকেই বুঝা যায়। আর্জেন্টিনার উপনিবেশ রক্ষার ছুতোয় বৃটেন যে দাঁত-নখ বের করেছিল একবার তা আমরা, এককালের বৃটিশ উপনিবেশের প্রজারা বেশ কৌতূহলের সাথেই লক্ষ্য করেছি। আসলে ইংরেজরা হল বর্তমানকালের নিধিরাম সর্দার। পার্থক্য হল, নিধিরামের নাকি ঢাল-তলোয়ার ছিল না। কিন্তু বৃটেনের আছে। তারা এখনও যুদ্ধ-বিমান, যুদ্ধাস্ত্র ও নৌবহর নির্মাণ করতে পারে। সাম্রাজ্যবাদী শক্তির চাকর-বাকরের ভূমিকা পালন করতে গিয়ে এশিয়া ও আফ্রিকাবাসীর ওপর হামলা চালনোয় সহায়তা করতে পারে। এধরনের সহায়তার মূল্য বর্তমান জমানায় অত্যধিক। তাছাড়া সাম্রাজ্যবাদী শক্তির দাম্ভিকতায় ইন্ধন যোগানো হল পরাশক্তির কাছে আনুগত্যের পরিচয়। বর্তমানে এই বিশ্বস্ততার পরিচয়-পত্রটি বৃটিশ জাতি গলায় ঝুলিয়ে রাখতে চায়।

তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ যদি বেধে যায় তবে ইংরেজ জাতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকেই সমর্থন করবে। কোন কারণ থাকুক বা না থাকুক, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিনাশপ্রাপ্ত হলে পৃথিবীতে ইংরেজদের অস্তিত্বও বিলুপ্ত হবে। বৃটিশ সরকারের মার্কিন তোষণনীতি দেখলেই

www.pathagar.com

আন্দাজ করা যায় যে, বৃটিশ জনগণ গণতন্ত্রের যতই পরাকাষ্ঠা দেখাক, কার্যক্ষেত্রে বৃটিশ সরকার তাদের তোয়াক্কা না করেই আমেরিকার স্বার্থরক্ষায় একপায়েখাড়া আছে।

যা হোক, আমরা আন্তর্জাতিক বৃটিশনীতি ও সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের রকমফের নিয়ে আলোচনায় প্রবৃত্ত না হয়ে ইংরেজ জাতির নৈতিক অধঃপতন নিয়ে একটু আলোচনা করতে আগ্রহী। একদা আমরা বৃটিশ ঔপনিবেশিক আমলে বিদ্বেষবশত তাদের কুৎসা গাইলেও তাদের সাহিত্য-সংস্কৃতি ও সামাজিক ব্যবস্থা, পারিবারিক শালীনতার গুণগান না গেয়ে পারিনি। যেসব নৈতিক গুণ একটি ক্ষুদ্র দ্বীপ থেকে তাদের অর্ধেকটা পৃথিবীর শাসক করে তুলেছিল এর মধ্যে প্রধান নৈতিক গুণ হল যৌন শালীনতা। লজ্জাস্থানের হেফাজত ও ধার্মিক বিধিনিষেধ যথা সম্ভব মেনে চলার প্রতি আগ্রহ। তাছাড়া সুকুমার-বৃত্তির ওপর ইংরেজ জাতির নির্ভরতার ইতিহাস আজও আমাদের শ্রদ্ধার উদ্রেক করে।

বর্তমানে এই জাতি যৌন কলুষতার সর্বশেষ ধাপে অবস্থান করছে। এর পরই তাদের জন্য রয়েছে, আমরা ধারণা করি, নিমজ্জনের অতল অন্ধকার। ঐ অন্ধকারেই বৃটিশ জাতি চিরকালের মত হারিয়ে যাবে বলে কেন জানি আশংকা হয়।

সম্প্রতি বৃটিশ সংবাদপত্রে ইংরেজ সমাজের যৌন বিকৃতির যে ভয়াবহ চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে তা যেমন ভয়াবহ, তেমনি জাতিহিসেবে ইংরেজদের চিরতমসায় নিমজ্জনের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। এক জরিপে দেখা গেছে, শিশুদের ওপর যৌন হামলা বেড়েছে শতকরা ১০ ভাগ। ১৪ বছরের কম বয়েসের প্রতি ৮ জন কিশোরীর একজন যৌন হামলার শিকার হয়েছে। ধর্ষণের যেসব ঘটনা পুলিশ তদন্ত করেছে এর বৃদ্ধির হার শতকরা ২৯টি। আর লণ্ডন শহরেই তা ৫০ ভাগ লাফিয়ে উঠেছে। তাছাড়া আট বছরের এক মেয়েকে ধর্ষণ করেছে এক ডাক্তার। আর এক পাদ্রী এক বছর ধরে একটি বালককে বলাৎকার করে চলেছে।

এই সবই পার্শ্বচিত্র। পুরা সমাজের অভ্যন্তরটা যে আরও ভয়াবহ এতে আর সন্দেহ কি? মনে হয় সমগ্র ইংরেজ জাতির পারিবারিক পরিবেশটাই আজ অন্ধকারে নিমজ্জিত। মনে হয়, বহুকালের জমাটবাধা পাপ আজ বৃটেনকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরছে। এ ধরনের অপরাধ শেষ পর্যন্ত একটা জাতির সর্বোচ্চ স্তরকেও রেহাই দেয় না। অতীতে ক্রিষ্টিন কীলারকে নিয়ে বৃটিশ রাজনৈতিক মহলের কেলেঙ্কারির ঘটনা বিশ্ববাসীর অজানা নয়। এবার এসেছে এর খানিকটা নিম্নস্তরের মানুষের ভেতররের খবর। কি ভয়াবহ এই দৃশ্য, একটি যৌনলোলুপ ইংরেজ পশু একটি আট বছরের বালিকার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ছে যৌন ক্ষুধা মেটাতে। যেখানে যৌন সুখ উপভোগের উপায়-উপকরণ সর্বত্র উন্মুক্ত অবস্থায় সুলভে পাওয়া সম্ভব, সেখানে একটি অক্ষতযোনী বালিকার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়া যে এক মাত্র অভিশপ্ত জাতির পুরুষদের পক্ষেই সম্ভব, এটা বোঝার মত ক্ষমতা সম্ভবত ইউরোপীয় সমাজের মানুষের আর অবশিষ্ট নেই। ধ্বংস হোক, সদোমী সমাজ ও জাতি!

২৪/৫/৮৬

www.pathagar.com

ধরিয়ে দিন

একটি দৈনিক সংবাদপত্রে 'ধরিয়ে দিন' এই শিরোনামে একটি সচিত্র বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়েছে। বিজ্ঞাপনে প্রকাশিত বক্সে দেখা যায় এক যুবতীর ছবির পাশে এক যুবকের ছবি। ছবিদৃষ্টে মনে হয় উভয়েই পূর্ণ যৌবনের রৌদ্রে অবগাহিত অবয়ব। বিজ্ঞাপনের সারবস্তু হল সাহানা বেগম নামে দুই সন্তানের মাকে মুকুল নামে এই যুবক ফুসলিয়ে নিয়ে গেছে। যাবার সময় সোনাদানাসহ প্রায় পঁচাত্তর হাজার টাকার মালামালও ওই যুগল অপহরণ করেছে এবং এদের নামে কোতোয়ালী থানায় একটি মামলাও দায়ের করা হয়েছে বলে বিজ্ঞাপনে উল্লেখ করা হয়েছে। বিজ্ঞাপনটি যিনি দিয়েছেন আমরা তার নাম উল্লেখ করতে চাই না। যদিও বিজ্ঞাপনে মুদ্রিত নামটি প্রকাশে তেমন কোনো দোষ হয় না। তবুও দুঃখী মানুষকে বিব্রত করা সংবাদপত্রের কাজ নয়। বিজ্ঞাপনটি যিনি দিয়েছেন জানি না সাহানা বেগমের তিনি কি হন। হয়তো হতভাগ্য স্বামী কিম্বা অভিভাবকদের কেউ হবেন। এ ধরনের একটি বিজ্ঞাপন যে মানুষ সহজে সংবাদপত্রে গাঁটের কড়ি খরচ করে এমনিতেই দেয় না তা আশা করি সকলেই বুঝতে পারছেন। যিনি দিয়েছেন তিনি দিশেহারা হয়েই এ কাজ করেছেন। হয়তো সংবাদপত্রে সংবাদ হিসাবে ছাপবার ব্যর্থ চেষ্টা করে ভদ্রলোক নিরুপায় হয়ে বিজ্ঞাপন বিভাগের শরণাপন্ন হয়েছেন। তাই যে বিষয়টি আগ্রহভরে সংবাদপত্রের রিপোর্টারগণ ছেপে কৃতিত্ব নেয়ার কথা তা তোয়াজ করে গাঁটের পয়সা খরচ করে বিজ্ঞাপন হিসাবে ছাপাতে হয়েছে। অর্থাৎ বাংলাদেশে এ ধরনের সংবাদের আর তেমন কোনো নিউজ ভ্যালু নেই। হরহামেশাই দুই/তিন সন্তানের জননীরা পর পুরুষের হাত ধরে সাবেক সংসার ভেঙে দিচ্ছেন। নতুন সংসার গড়তে পারুন বা না পারুন দেহের চাহিদাই বড় কথা। দেহের ক্ষুধা যখন মিটছে তখন নতুন সংসার হোক ক্ষণস্থায়ী হোটেলের কামরা অথবা বেশ্যালয় তাতে কি আসে যায়? উদ্দেশ্য যেখানে হঠাৎ উত্তেজিত দৈহিক পুলক সেখানে নৈতিকতার প্রশ্ন আর কে উত্থাপন করতে যাবে? কারণই আমাদের নতুন মেট্রোপলিটান সমাজে নৈতিকতার মানদণ্ড দারুণভাবে অস্থির। এর কোনো স্থিতিস্থাপকতা তৈরী হয়নি। ভবিষ্যতে যে হবে তারও কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। মনে হচ্ছে আমরা এতদিনে সত্যিকার আধুনিক আরবান সমাজে পদার্পণ করেছি। কারণ জাতিগত, ঐতিহ্যগত ও ধর্মীয় মূল্যবোধ দিয়ে এখন আর লজ্জা-শরম, নৈতিকতা-অনৈতিকতার বিচার করা চলে না। যারা বিচার করতে চাইবেন তারা মুখের কথায় এখন আর তা পারবেন না। হয় ব্যভিচারকে, পশ্চিমা জীবন-যাপন পদ্ধতিকে পথ ছেড়ে

www.pathagar.com

দিতে হবে কিম্বা ব্যাপক আন্দোলনের মাধ্যমে দেশবাসীকে উদ্বুদ্ধ করে এক ধর্মীয় মূল্যবোধের পুরুত্থানবাদী বিপ্লবী শক্তির দ্বারা তা প্রতিরোধ করতে হবে। আমাদের মনে হয় বর্তমানে রাজধানী এলাকায় পশ্চিমা সংস্কৃতি যে ঢেউ লেগেছে তা আরোপিত। স্বতঃপ্রণোদিত নয়।

আমাদের পরিবারগুলোর ভেতরে খুব আস্তে আস্তে নীতিহীনতা ও অশ্লীলতার ঘুণ ঢুকে পড়েছে। পরিবারগুলোতে এক আকস্মিক অবাধ মেলামেশার পরিবেশ তৈরী হয়েছে। এখন পরিবারে আগত অপরিচিত অতিথিদের অপ্যায়ন করেন গৃহিণী, বধূ ও গৃহকন্যারা। আগে যেখানে পরিবারে অপরিচিত লোক এলে ঘরের পর্দা সম্বন্ধে সমগ্র পরিবারের সতর্ক থাকাটাই ছিলো শরাফতি এখন ঘরের যুবতী কন্যা বা গৃহবধূ অতিথির গা ঘেঁষে বসে রঙ্গালাপ করাটাই হলো 'ভদ্রতা'। এই ভদ্রতা বজায় রাখতে গিয়ে কত সুখের সংসার যে ভেঙে যাচ্ছে তার ভুরি ভুরি খবর সংবাদপত্রে প্রকাশ পেতে পেতে এখন তা আর পাঠককে চমকিত করে না। যেহেতু এ ধরনের খবরে পাঠক সাধারণ আর তেমন চমকে ওঠে না। মনে করে এতো হলো প্রাত্যহিক ডালভাত ধরনের বস্তাপচা খবর। সে কারণে সংবাদপত্রেও এর গুরুত্ব কমে গেছে। কারো বউ যদি স্ব-ইচ্ছায় অন্য কারো অর্থাৎ পর-পুরুষের হাত ধরে ঘরের বাচ্চা-কাচ্চা ফেলে চলে যায় তবে কার কি বলার আছে? সমাজের যখন কিছু বলার নেই তখন সংবাদপত্রেরও কিছু করার নেই। আপনার প্রিয়তমা পত্নী দুই সন্তানের জননী যদি আপনারই ডেকে এনে বৌয়ের সাথে পরিচয় করিয়ে দেওয়া বন্ধুর সাথে হাওয়া খেতে কিম্বা আপনার হাতের বাইরে চলে যায় তবে এর আর নিউজভ্যালু কতটুকু? কেন এ সংবাদটি সংবাদপত্র ছাপতে যাবে? তবে আপনি পালিয়ে যাওয়া প্রেয়সীর সাথে হারিয়ে যাওয়া সোনার অলংকারগুলোর জন্য থানায় মামলা ঠুকে সংবাদপত্রে একটি বিজ্ঞাপন ছাপতে পারেন। বিজ্ঞাপনে পালিয়ে যাওয়া আপনার প্রিয়তমার ছবির সাথে আপনার বন্ধু বা পরিচিত যুবকটির ছবিও ছাপতে পারেন। বিজ্ঞাপনের শিরোনাম দেবেন এদের ধরিয়ে দিন ইত্যাদি।

মুকুল সাহানাকে ফুসলিয়ে নিয়ে গেছে। এই ফুসলানো কি প্রেম? না কোনো যৌন ইঙ্গিতদ্বারা বশীভূত করে ঘরের বাইরে নিয়ে আসা তা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে না। বিজ্ঞাপনে তা তেমন বিশদ করে কিছু বলা নেই। শুধু বেদনার অংশ হল এটুকু সাহানার দু'টি সন্তানকে সে ফেলে গেছে।

আমাদের কথা হলো, আজকাল পাড়ায় পাড়ায় এ ধরনের ঘটনার আধিক্য সামাজিক এই সমস্যাটিকে একটা নিত্যনৈমিত্তিক স্বাভাবিক ঘটনা হিসাবে মেনে নিতে অভ্যস্ত হয়ে যাচ্ছে। যেটুকু প্রতিক্রিয়া তা হলো পরিত্যক্ত গৃহের ভেতরকার মানুষটির। যিনি মনে করতেন নর-নারীর অবাধ মেলামেশা একটি স্বাভাবিক শালীন ঘটনা। নারীর অবাধ মেশার কিম্বা নারীকে বেপর্দা আবহাওয়ার মধ্যে রাখাকে যিনি দোষণীয় দূরের কথা একটি অতিশয় ন্যায়সঙ্গত ব্যাপার বলে মনে করতেন। তার বুকে যখন বউ

www.pathagar.com

পালিয়ে যাওয়া কিম্বা কন্যা পালিয়ে যাওয়ার মত ঘটনা আছড়ে পড়ে তখন জানি না সেই প্রগতিশীল মানুষটির একবারও কি সনাতন ধর্মীয় আবরণাদির অলৌকিক পাহরার কথা ঝিলিক দেয় না? মনে হয় না মুসলিম সমাজের প্রতিক্রিয়াশীল (?) পর্দা প্রথাটি এক উচ্চস্তরের বিজ্ঞান সম্মত সামাজিক রক্ষাকবচ?

ঢাকায় বর্তমান সামাজিক নৈতিকতার পরিধিটি সত্যি অধঃপতিত। যাকে বলে সামাজিক শ্লীলতাবোধ তার কোনো বালাই নেই। জীবনযাপন, বাজার খেলাধুলা, সিনেমা থিয়েটার সর্বত্র বর্তমানে নর-নারীর শারীরিক উন্মোচনই হলে সমস্ত প্রগতিশীল আন্দোলন, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রগতির মূল কথা। আমাদের সংস্কৃতি এখন আর সদ্যফোটা কিশোরীকে বলে না যে, লজ্জাই হলো নারীর ভূষণ। যার লজ্জা নেই তার কিছুই নেই।

আমাদের সিনেমার নায়িকারা মুসলিম নারী দূরে থাক সম্প্রদায় নির্বিশেষে বাংগালী নারীর স্বাভাবিক আবরণটুকুও আর ধরে রাখতে চায় না। শতাব্দীকাল ধরে আধুনিক চলচ্চিত্রের সাধনা, চর্চা ও অভিনয় করেও পশ্চিমবঙ্গের মধ্যবিত্ত বাংগালী হিন্দু নারীরা যে অধঃপতনের সম্মুখীন হননি ঢাকায় হঠাৎ গজিয়ে ওঠা চলচ্চিত্র শিল্পের নায়িকারা সেই নরকই গুলজার করে তুলেছেন। তাদের সামাজিক জীবনে কিম্বা পর্দায় যেখানেই দেখা যাক না কেন দেখা যায় শরীরে আবরণ রাখাটাই বুঝি এই ঈভদের কাছে অসভ্যতা।

সামাজিক মূল্যবোধ পালটেছে, একথা কমবেশী আমরা প্রতিক্রিয়াশীলরাও স্বীকার করি। তবে মানবজাতির কতগুলো চিরন্তন মূল্যবোধ যেমন নারীর লজ্জা ও সতীত্বের বোধও যদি নির্লজ্জতা ও অসতীত্বে মোড় ঘুরে যায় এবং তা সামাজিক স্বাভাবিকতায় মেনে নেয়ার চেষ্টা চলে তবে সে সমাজকে আমরা মুসলমানরা মানুষের সমাজ না বলে বনমানুষের সমাজ হিসাবে চিহ্নিত করতে চাই। তাছাড়া আমাদের আর কিইবা করার আছে।

একটি জাতি যখন নৈতিকভাবে বিনাশপ্রাপ্ত হয় তখন সে তার অতিশয় গোপন আবরণীয় অঙ্গসমূহের প্রদর্শন শুরু করে। তার সামাজিক কল্যাণের বোধশক্তি পাল্টে যায় আর শিল্পদৃষ্টি এমন একটি আচ্ছন্নতার আবিষ্ট হয় যে সে যৌনতার কুয়াশা ছাড়া আর কিছুই দেখতে পায় না। এমন কি তাদের ব্যবসায়িক বিজ্ঞাপনেও নারী অঙ্গের প্রদর্শনে পর্যবসিত হয়। তা না হলে তাদের পণ্যের কাটতি হয় না। এ অবস্থাটি হলো ধনতন্ত্রের শেষ অবস্থা। এরপরই পতন অথবা ভয়াবহ সামাজিক বিপ্লব। সম্ভবত বাংলাদেশেও এই নিয়মের ব্যতিক্রম হবে না।

যৌনতা ও অশ্লীলতায় বাংলাদেশের সৃজনশীল ও উদ্ভাবনাময় দৃষ্টিকোণ কিভাবে পাল্টে যাচ্ছে তার একটি দৃষ্টান্ত সরকারী ও জাতীয় প্রচার মাধ্যম টেলিভিশন থেকেই দেখানো যায়। কোনো পরিবারের কোনো কিশোরী শিল্পী যদি টেলিভিশনে কোনো

www.pathagar.com

ম্যাগাজিন অনুষ্ঠানে কোনোপ্রকারে একবার গান গাইবার সুযোগ পায় তবে তার কণ্ঠস্বর, গানের বিষয়, স্বর নিক্ষেপের স্টাইল এসব কিছুকেই ক্যামেরায় প্রধান বিষয় হিসাবে ধরা হয় না বরং মেয়েটির শারীরিক সৌন্দর্য চেহারা থেকে শুরু করে বিভিন্ন এ্যাঙ্গেল থেকে গলদেশ, বক্ষস্থল, অসাবধানে উন্মুক্ত আবরণীয় দেহসৌষ্ঠবকে প্রধান করে তোলা হয়। এবং বার বার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখানো হতে থাকে। কার সাধ্য শিল্পীর গানের মাধুর্যটি উপভোগ করে? এই হলো আমাদের সাম্প্রতিককালের সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি।

এই অবস্থায় ঘরের বউ, সন্তানের মাতা, যুবক বন্ধু বা আগন্তুক কারো সাথে পালিয়ে যাবে না তো কি হবে? এদেশে নারী স্বাধীনতার আন্দোলনকারীর কোনো অভাব নেই। অভাব হলো শালীনতা বোধ, পর্দা ও আবরণের। কেউ অস্বীকার করতে পারবেন না বাংলাদেশের আধুনিক পারিবারিক ব্যবস্থা এর হাজার বছরের ভিত্তিভূমি থেকে এক ধরনের উদ্দেশ্যহীনতার দিকে লাগামছাড়া ঘোড়ার মত ছুটতে আরম্ভ করেছে। যেন এর কোন অভিভাবক নেই, কোনোকালে ছিল না।

আমরা এ অবস্থাটি আর মানতে পারছি না। আমরা মনে করি যতই আধুনিকতার ঢেউ লাগুক না কেন, এর ভিত্তিভূমিতে আমাদের ধর্মীয় মূল্যবোধ অর্থাৎ ইসলামী আরক্ষা ব্যবস্থা অবশ্যই প্রতিষ্ঠিত থাকবে। মুসলিম নারীর যে সামাজিক বিধিনিষেধ আছে তা সরকারী-বেসরকারী কোন প্রচার মাধ্যমই লংঘন করতে পারবে না। এ ব্যাপারে দেশের সরকার উদ্যোগী না হলে অবশ্যই সমাজের খুঁটি স্বরূপ আলেম সমাজকে এগিয়ে আসতে হবে।

আমরা সাহানা বেগমের স্বামী বা অভিভাবকের প্রতি সহানুভূতিশীল। তবে এই সঙ্গে এ কথাও না বলে পারছি না, সাহানা দু'টি সন্তান ও তার সযত্নে সাজানো সংসার ত্যাগ করে চলে যাওয়ার পেছনে কি এমন কারণ ছিল যে, একজন গৃহবধূ বহুদিনব্যাপী পর-পুরুষের সাথে অবাধ ও অবৈধ মেলামেশার সুযোগ পেয়েছিল? কোনো মুসলিম বধূর কি এ সুযোগ থাকা উচিত? সাহানাকে কে এমন সুযোগ দিয়েছে? যারা চলতি হাওয়ার স্বেচ্ছাচারিতায় আপন স্ত্রী-কন্যাকে বন্য-পরগাছার মত বাড়তে দিয়েছে আজ তাদের পস্তানোর দিকে কে আর কান দেবে?

১৪/৬/৮৪

www.pathagar.com

সাংস্কৃতিক বেহায়াপনা

বেহায়াপনাকে কোনো দেশের মানুষই নিজেদের জাতীয় সংস্কৃতির অঙ্গ বলে স্বীকার করে না। যদিও সকল জাতির মধ্যেই সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে একদল দুষ্ট লোক থাকে যারা বেহায়াপনা দেখিয়ে মানুষের কু-প্রবৃত্তিকে উস্কানি দেয় এবং বেহায়াপনাকে সভ্য মানুষের সংস্কৃতি বলে চালাতে চায়। বাংলাদেশের সমাজ মূলত গ্রামীণ যৌথ কৃষি সমাজেরই দারিদ্র্যক্লিষ্ট এক সহনশীল সংগ্রামী সমাজ। যারা প্রতিনিয়ত শোষণ, বঞ্চনা ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্যে জীবন-পণ লড়াই করে টিকে আছে। থাকবেও।

এ ধরনের সমাজের সবচেয়ে বড় গর্ব তারা স্বপ্ন দেখতে এবং স্বপ্ন রচনা করতে জানে। এ জন্যও দেখা যায় তৃতীয় বিশ্বের অতি দরিদ্র কৃষি সমাজের মধ্যেও মৌলিক কবি প্রতিভা, জীবনবাদী উপন্যাসিক, নাট্যকার, প্রভৃতির জন্ম হয়। মানব সভ্যতার বস্তুগত দারিদ্র্য তারা ভাব-কল্পনার দ্বারা মিটিয়ে দিয়ে মানব সমাজকে ভবিষ্যৎ ভরসার দিকে এগিয়ে নেয়। তাদের সংস্কৃতি হল মূলত মানবজাতির রুচিশীলতারই পরিচ্ছন্ন দলিল। এই দলিলে বাংলাদেশী জাতি বহুকাল যাবতই তাদের স্বাক্ষর রাখার গৌরব লাভ করেছে।

সংস্কৃতি নিয়ে বাংলাদেশের মানুষের যে আত্মতৃপ্তি ছিল, সম্প্রতি কিছু অর্থ-লোলুপ লালসাপরায়ণ দুষ্ট লোকের জাতীয় সংস্কৃতির ক্ষেত্রে অনধিকার চর্চার ফলে তা নস্যাৎ হয়ে যেতে বসেছে। একদল লোক সংস্কৃতির নামে বেহায়াপনাকে পুঁজি করে আজ ব্যবসায়ে নেমেছে বলে ধারণা হয়। এতদিন এ ব্যবসা দেশের ভেতর চালিয়ে এরা কোনোরূপ বাধার সম্মুখীন হয়নি বলে এখন এদের সাহস এতদূর বৃদ্ধি পেয়েছে যে, লেবেল লাগিয়ে দেশের রোজগারী বাংলাদেশীরা যেসব প্রবাসী শহরে প্রবাস যাপন করে সেখানেও হানা দিতে শুরু করেছে। মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে বাংলাদেশকে একটি অতিশয় দরিদ্র দেশ বলে অবজ্ঞা করলেও বৃহত্তর ইসলামী দেশ বলে আবার অন্যদিকে শ্রদ্ধাও করে। দারিদ্র্য এক সময় মধ্যপ্রাচ্যকেও শত শত বছর আষ্টে-পৃষ্ঠে বেঁধে রেখেছিল। যেমন আমাদের বেঁধে রেখেছিল। উপনিবেশিক শাসন। আজ উপনিবেশিক শাসন উচ্ছিন্ন হয়ে গেলেও আমরা এর জ্বালা একেবারে ভুলে যাইনি। তেমনি মধ্যপ্রাচ্যের মানুষেরা এখন সম্পদের পাহাড়ের ওপর থাকলেও অতীতের দারিদ্র্যের পেষণের কথা তারা একেবারেই ভুলে যায়নি। এ কারণেই শত দোষ-ত্রুটি, প্রতারণা ও মিথ্যাচারের অভিযোগ থাকলেও বাংলাদেশের মানুষকে দ্বীনী ভাই, উম্মার অবিচ্ছেদ্য অংশীদার হিসেবে মধ্যপ্রাচ্যে মানুষ স্বীকার করে নিয়েছে।

এই স্বীকৃতির মধ্যেই মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে শত শত বাংলাদেশী যুবক মাথার

www.pathagar.com

ঘাম পায়ে ফেলে খেটে অর্থ উপার্জন করছে। এ উপার্জন দিয়ে তারা যেমন নিজেদের অবস্থার পরিবর্তন প্রয়াসী, তেমনি এতে দেশের অশেষ উপকার সাধন হচ্ছে। দেশের অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড সিধা রাখতে ওয়েজআর্নারদের অবদান এখন সর্বক্ষেত্রেই স্বীকৃত। যদিও এই উদ্যমে সরকারী সহায়তা ও পৃষ্ঠপোষকতা যতটা থাকার কথা ছিল তার তিল পরিমাণ সাহায্যও ওয়েজআর্নারদের কপালে জোটেনি। বিদেশে বাংলাদেশের মিশনগুলোর আলসেমী, বিদেশে দেশের শ্রমিক-কর্মচারী ও ভ্রমণকারীদের ব্যাপারে ক্ষমাহীন ঔদাসীন্য এবং অবজ্ঞার কথা এখন দেশবাসীর অজানা নয়। মূলত দেশের পরিশ্রমী ও পরবাসী মানুষের প্রতি এদের অবজ্ঞা এমন এক পর্যায়ে উপনীত হয়েছে যে, যারা বিদেশে যান তারা এটা জেনেশুনেই যান যে তাদের স্বার্থের ব্যাপারে বাংলাদেশ মিশনের কাছে কিছুই আশা করার নেই। কেউ এদের ওপর ভরসা করে বিদেশে পাড়ি জমান না। এ কারণে অনেক ন্যায়সঙ্গত ব্যাপারেও বিদেশ বিভূঁইয়ে পরবাসী শ্রমিকদের মুখ বুঁজে অপমান সহ্য করে পয়সা রোজগার করতে হয়।

সাধারণত এই সব শ্রমিক ও ওয়েজআর্নাররা বিদেশে বাংলাদেশ মিশনের মোটা বেতনের অনেক অলস কর্মচারী ও কূটনীতিকদের চেয়ে দেশকে অধিক ভালোবাসে। দেশের সম্মানকে তারা নিজেদের সম্মান মনে করে। এই সম্মান কোথাও ক্ষুণ্ন হতে দেখলে তারা সহ্য করতে পারে না। তাদের এতে বুক ফেটে যায়।

সম্প্রতি আরব আমিরাতের কয়েকটি দেশে বাংলাদেশের সংস্কৃতির নামে যে বেহায়াপনা প্রদর্শিত হয়েছে তা সেখানকার প্রতিটি প্রবাসী বাংলাদেশীর মর্যাদাকে ক্ষুণ্ন করেছে বলে পত্রিকান্তরে প্রকাশিত হয়েছে। বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক দলের ব্যাপারে আমিরাতের কয়েকটি শহরে সম্প্রতি নির্লজ্জ নৃত্যগীত, জাদু ও তামাশার ধুমধাম অনুষ্ঠিত হয়েছে বলে সংবাদপত্রে খবর প্রকাশিত হয়েছে। শোনা যাচ্ছে এতে বাংলাদেশের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক মর্যাদা ধূলায় লুণ্ঠিত। জানা গেছে, বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক দলের নামে করে এসব অনুষ্ঠিত হলেও বাংলাদেশ সরকার বিষয়টি অবহিত নয়। এ ধরনের উদ্যোগ সরকারীভাবে গ্রহণ করা না হলেও, বাইরের দর্শকগণ যে এসব বেহায়াপনাকে বাংলাদেশী সংস্কৃতি হিসেবেই ধরে নেবেন এতে কোনো সন্দেহ নেই। এবং ধরে নিয়ে হাসাহাসিও কম হচ্ছে না।

আমরা মধ্যপ্রাচ্যে এ ধরনের মানহানিকর অপসাংস্কৃতিক উদ্যোগের বিরোধিতা করি। এতে বাংলাদেশ সম্বন্ধে বাইরে শুধু বিরূপ ধারণাই হচ্ছে না বরং বিদেশে কর্মরত বাংলাদেশীদের লজ্জায় মাথা কাটা যাচ্ছে। আমরা জানি না কারা এইসব অপকর্মের উদ্যোক্তা। তবে এটা বুঝি, অমুক প্রিন্সেস বা তমুক প্রিন্সেস বলে খ্যাত যাত্রাদলের খেমটা নাচুনীরা বাংলাদেশের জাতীয় সংস্কৃতির প্রতিনিধিত্ব করে না। তারা দেশের ভেতরে যেমন অশ্লীল নাচগানে তরুণ সমাজের অধঃপতন ডেকে আনছে তেমনি দেশের বাইরে গিয়েও ছড়াচ্ছে চরম বেহায়াপনা।

এইসব বেহায়াপনার দালালরা সম্প্রতি বেশ সাহসী হয়ে উঠেছে। এখন তারা তথাকথিত প্রিন্সেসদের বাদ দিয়ে আরও ওপরের দিকে হাত বাড়াচ্ছে। সম্প্রতি দেশের জনৈক খ্যাতনামা অভিনেত্রী খবরের কাগজে এক মারাত্মক অভিযোগ উত্থাপন করে

www.pathagar.com

দেশবাসী ও সরকারের কাছে এর প্রতিকার দাবী করেছেন। তিনি তার বাসায় এক সাংবাদিক সম্মেলনে জানিয়েছেন যে, দু'জন সংগীত পরিচালক প্রবাসী বাঙ্গালীদের সমিতি এদেশের কয়েকজন প্রখ্যাত চিত্রতারকাকে সম্বর্ধিত করবেন এই প্রলোভন দেখিয়ে আরব আমিরাতে নিয়ে যান। কিন্তু সেখানে গিয়ে চিত্র-তারকাগণ দেখতে পান যে, পুরো ব্যাপারটাই একটা মস্তবড় ফাঁকি। অভিযোগকারিণী প্রথমে ঘটনাটা বুঝতে না পেরে একটি অনুষ্ঠানে অংশ নেন। কিন্তু পরে জানতে পারেন যে, উপরোক্ত সংগীত পরিচালকদ্বয় ইতিপূর্বে আবুধাবীতে তথাকথিত প্রিন্সেসদের এনে অশ্লীল নৃত্যগীত পরিবেশন করে যথেষ্ট দুর্নাম ও অখ্যাতি কুড়িয়ে গেছেন এবং এখন বাংলাদেশের প্রখ্যাত চিত্রতারকাদের সম্বর্ধনার নাম করে একই মতলবে সেখানে এনে হাজির করেছেন।

সম্বর্ধনালোভী চিত্রতারকাগণ অগত্যা আর কি করতে পারেন? আমরা জানি না এ অবস্থায় দেশের চিত্রতারকাগণ দালালদের ইচ্ছানুযায়ী অনুষ্ঠানাদি করেছেন কিনা। তবে যিনি দেশে এসে এ প্রসংগ তুলে সাংবাদিক সম্মেলন করেছেন, আমরা তার আত্মমর্যাদাবোধের প্রশংসা করি। তিনি অভিযোগ করেছেন, একটি মাত্র অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে তিনি চাতুরীটা বুঝতে পেরে আর অগ্রসর হননি। আর কোনো অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেননি। আমরা তার এই প্রতিবাদের জন্য তাকে ধন্যবাদ জানাই। তার এই প্রতিবাদের জন্য উদ্যোক্তারা নাকি তার সাথে পরে অসহযোগিতা ও অবহেলার চূড়ান্ত করেছেন। তবুও আশার কথা আমাদের মধ্যে এমন একজন চিত্রনায়িকাও আছেন, যিনি দেশের মর্যাদাকে নিজের মর্যাদা মনে করে দৃঢ়তা দেখিয়েছেন, প্রতিবাদ করেছেন এবং সরকার ও দেশবাসীর কাছে এর প্রতিকার প্রার্থনা করেছেন।

আমরা এই আত্মমর্যাদা বোধসম্পন্ন অভিনেত্রীর অভিযোগের প্রতি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করি। সংস্কৃতির নামে একদল লোক দেশের মর্যাদাকে বিদেশের মাটিতে শুধু টাকার জন্য বিক্রি করে দেবে, এটা অবিলম্বে বন্ধ হওয়া উচিত। আমরা বুঝতে পারি না, পাসপোর্টধারী ব্যক্তিরা কি করে সরকারী ব্যবস্থাকে ফাঁকি দিয়ে দেশের বাইরে গিয়ে জাতীয় সংস্কৃতির নামে বেহায়াপনার বাজার বসায়। বাংলাদেশের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় এ ব্যাপারে অনবহিত এটা আমরা মনে করি না। নিশ্চয় বিষয়টির প্রতি তাদের দৃষ্টি পড়েছে। তবে এসব ব্যাপারে তাদের চিন্তা-ভাবনা কি তা জানার জন্য দেশবাসীর একটা উপায় থাকা দরকার। আমরা মনে করি, দেশের বাইরে গিয়ে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের নামে যারা দেশের মর্যাদা ও সামাজিক শালীনতাকে কলংকিত করে এসেছে, তাদের যথোপযুক্ত বিচার হওয়া দরকার। তারা যাতে যখন-তখন দেশের বাইরে গিয়ে কোনো অনুষ্ঠানাদির আয়োজন না করতে পারে, সে ব্যাপারে বিধি-নিষেধ আরোপ করা দরকার। তা ছাড়া, বর্তমান সরকারের সাংস্কৃতিক নীতিমালা সম্বন্ধেও দেশবাসীকে অবহিত করা প্রয়োজন। বাংলাদেশ একটি মুসলিম দেশ। ইসলাম বিরোধী কোনো সাংস্কৃতিক তৎপরতা যাতে বাইরে গিয়ে বাংলাদেশ সম্বন্ধে বিরূপ ধারণা সৃষ্টি করতে না পারে সেদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখার সময় এসে গেছে বৈকি!

৪/৭/৮৭

www.pathagar.com

একটু আড়াল চাই

নারী মাত্রেরই এক ধরনের আড়াল দরকার। এমন কি আমরা যাদের চরম আধুনিকা বলে জানি তাদেরও সর্বক্ষণ উন্মুক্ত অবস্থায়, পর-পুরুষের সন্ধানী চোখ যেখানে সজাগ, সেখানে ঘুরে-ফিরে বেড়ানো সম্ভব নয়। তাদেরও সারাদিনের মধ্যে অন্তত কিছুক্ষণ অন্তরালে নিজের নিজস্বতা অর্থাৎ নারীত্বের গৌরবকে গোপন রাখতে হয়। যদি কারো এই আবরণও উঠে যায় তবে সেই নারীর বিনাশ কেউ ঠেকিয়ে রাখতে পারে না।

এই জন্যই ইসলাম নারীর সব রকম জাগতিক স্বাধীনতার স্বীকৃতি দিয়েও পর্দার বিধান ঘোষণা করেছে। প্রকৃতপক্ষে পর্দা হল আদমের কন্যাদের বিশ্রাম। এই বিশ্রাম পুরুষদের দেওয়া হয়নি বলেই তারা অবচেতন মনে নারীর আত্মরক্ষার প্রয়াসে ঈর্ষান্বিত। তারা সুযোগ পেলেই এই আবরণ ছিঁড়ে ফেলতে চেয়েছে। কিন্তু পৃথিবীতে পবিত্র কুরআন নাযিল হওয়ার পর নারীত্বের যে মর্যাদা সৃষ্টি হয়েছে অর্থাৎ আত্মরক্ষার বিধানের মধ্যে নারীত্বের স্বাধীনতা রক্ষার যে অবকাশ তৈরী হয়েছে তা শুধু ইসলাম বিশ্বাসী বিশ্ববাসীই নয়, ইসলামের বৈরী জনগোষ্ঠীও এর সুফল ভোগ করতে ছাড়েনি। ইউরোপ ও এশিয়ার মধ্যযুগের পারিবারিক ইতিহাস পাঠ করলেই অমুসলিমদের পর্দা রাখার রেওয়াজের কথা জানা যায়। এমনকি ভারতেও পাঠান বা মুঘল আমলে রাজপুত হিন্দু নারীরা পর্দা মেনে নিজেদের অসূর্যম্পর্শ্যা বলে গৌরববোধ করতো।

নারীত্বের অসম্মান শুরু হয় ইউরোপে ধনতান্ত্রিক যুগে। পুঁজিবাদই নারীকে পণ্যে পরিণত করে। এর আগে সামন্ত যুগে নারী খুব সুখে বিশ্রামের মধ্যে ছিল আমরা একথা বলছি না। তখনও যুদ্ধে ও বিপ্লবে নারীদের অসম্মানের অবধি ছিল না। তখনও গরু-ছাগলের মত পরাজিত নারীদের ঘৃণ্য দাসত্বের শৃংখলে আবদ্ধ করা হত। কিন্তু ধনতান্ত্রিক যুগে কল-কারখানা, মিল ফ্যাক্টরীর ব্যাপক উদ্ভবকালে নারী হল প্রকৃত পণ্য। অর্থাৎ বাজারের মনোহারী জিনিসের মত। রূপসী নারীর বাজার দর এমনভাবে নির্দিষ্ট হতে থাকলো, কে বলবে যে মেয়েরোও মানুষ? এ প্রসঙ্গে কার্ল মার্কসের কতিপয় বিশ্লেষণের মূল্য অনস্বীকার্য। তিনি পুঁজিবাদী সমাজে নারীর পণ্যে পরিণত হওয়ার যে দৃষ্টান্ত উত্থাপন করেছেন তা বাস্তবিক তার অন্তরদৃষ্টির পরিচয় বহন করে। আমরা তার নারীত্বের সমান অধিকারের দাওয়াই অর্থাৎ কম্যুনিজমে নারীত্বের মুক্তি এই তত্ত্বের ঘোর বিরোধী হলেও, পুঁজিবাদী সমাজে নারীর পণ্যে পরিণত হওয়ার ভয়াবহ চিত্রটি যথার্থ মনে করি।

www.pathagar.com

বর্তমানে ঐ অবস্থারই চরম রূপ পাশ্চাত্য সমাজের সর্বত্র নারীকে অধপতনের সর্বশেষ ধাপে নামিয়ে এনেছে। এই অধপতন এককভাবে শুধু যে পাশ্চাত্যের পুঁজিবাদী ফ্রি সোসাইটিতে দেখা দিয়েছে তা নয়, সেখানকার সমাজতান্ত্রিক সমাজেও নারীর মূল্য তার দেহ অর্থাৎ যৌন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছে। নারী মানেই নারী দেহ। তার আত্মা, মাতৃত্ব, শ্রম ইত্যাদি ক্রমান্বয়ে ধসে পড়ছে। এখন পাশ্চাত্য সমাজের সর্বত্র নারী হল ভোগ ও বিজ্ঞাপনের সামগ্রী। এত করেও তার বিশ্রাম নেই। এত ভোগের পরও পুরুষ তার দায়িত্ব নিতে রাজী নয়। তাকে তার নিজের শ্রমে ভরণ-পোষণ চালাতে হবে। কারণ সে স্বাধীন। কোনো প্রকাশ্য শৃংখলে পুরুষ তাকে আর বেঁধে রাখছে না। রাখছে না অন্তপুরে আটক। এমনকি পর্দার আড়াল ও আব্রুর সাথেও তার কোন পরিচয় ঘটেনি। এমতাবস্থায় কে তার দায়িত্ব নেবে? পুরুষ যৌন সম্ভোগের কৃতজ্ঞতা প্রকাশকে এককালের 'প্রেম' নামে অভিহিত করতো। এ নিয়ে কবিরা কত কবিতার জন্ম দিলেন। অমর সেসব রোমান্টিক কবিতার যুগ এখন কালের গর্ভে বিলীন হয়ে গেছে। কারণ পুরুষ বুঝতে পেরেছে তার ইচ্ছার মত নারীরও আকাংখা সমানভাবেই প্রবল। এই স্বাধীন বিনিময়ের জন্য প্রেমের বা কৃতজ্ঞতার কি প্রয়োজন? সম্ভোগের পর তাকে পথে বের করে দাও। সে তার স্বাধীনতার এবং অস্তিত্বের স্বাতন্ত্র্য ভোগ করুক। নারী তো নিজেই বেছে নিয়েছে এই পথ। এই পথে বাধা সৃষ্টির দায়িত্ব থেকে পাশ্চাত্য পুরুষ সমাজ সম্পূর্ণ মুক্ত। আর সর্বনাশের স্বাধীনতাকে নিশ্চিত করেছে পাশ্চাত্য আইন। যে আইন আল্লাহর বিধানকে তোয়াক্কা না করেই রচিত হয়েছে। যে আইন শুধু জাহান্নামের পথকে নিষ্কন্টক করে। বঞ্চিতকে আশ্রয়, অবসর অথবা বিশ্রাম দেয় না। ধ্বংস হোক সেই আইন ও আইন প্রণয়ণকারী অস্তিত্ববাদী সমাজ।

এই সমাজ এখন নারীর দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বিস্তার ও বিকাশের সম্প্রসারণ, উচ্চতা , স্ফীতি এবং গঠন-সৌন্দর্যের মূল্য নির্ধারণেরও প্রতিযোগিতার আয়োজন করতে বিশ্বনারী সমাজকে প্রলুব্ধ করছে। এই প্রতিযোগিতার গালভরা নাম রাখা হয়েছে 'বিশ্ব সুন্দরী প্রতিযোগিতা।' পাশ্চাত্যের প্রতিটি দেশেই এই প্রতিযোগিতার আয়োজন এক ন্যক্কারজনক পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে। পাশ্চাত্যের প্রতিটি দেশ আগে নিজেদের যুবতী মেয়েদের অর্ধ উলঙ্গ অবস্থায় একই মঞ্চে সমবেত করে তাদের দেহ-সৌন্দর্যের খুঁটিনাটি পরীক্ষা করে এক-একজনকে সে দেশের 'সুন্দরী শ্রেষ্ঠা' ঘোষণা করে। পরে ঐসব সুন্দরীশ্রেষ্ঠারা বিশ্বসুন্দরী প্রতিযোগিতায় নামমাত্র পোশাক গায়ে রেখে প্রায় উলঙ্গ অবস্থায়, মঞ্চে আরোহণ করে। তাদের শরীরের সর্বাঙ্গের মাপজোখ নিয়ে তাদের মধ্যে একজনকে এক বছরের জন্য 'বিশ্বসুন্দরী' বলে ঘোষণা দেওয়া হয়। তাকে পুরস্কৃত করা হয় স্বর্ণমুকুট, স্বর্ণদণ্ড ও বিপুল অর্থে। একবার এই প্রতিযোগিতায় কেউ বিজয়িনী হতে পারলে তার আর সুখের সীমা নেই! সারা জগতে তার নগ্নদেহের সৌন্দর্য ছড়িয়ে পড়বে। তার জন্য অর্থ, বিত্ত, প্রেম ও সুখের ছড়াছড়ি। পুরুষ মাত্রই ঐ নারীকে তোয়াজ

www.pathagar.com

করবে। রাষ্ট্রীয় ভোজসভায় তার নিমন্ত্রণ হবে। পুরষের পাল পাগলের মত ছুটবে তার পিছে পিছে। এই হল বিশ্বসুন্দরীদের ব্যাপারে সকলের ধারণা। বিশ্বের রমণীকুল ঈর্ষায় জ্বলতে থাকবে, আহা আমি কেন বিশ্বসুন্দরীর ভাগ্য নিয়ে জন্মালাম না?

বিশ্বসুন্দরী সম্বন্ধে এই জমকালো ধারণা সম্প্রতি একটু টাল খেয়ে পড়েছে। আজ এই নিয়েই আমাদের নিবন্ধ। আমরা যেমন ভাবি ব্যাপারটা যে তেমন সুখকর নয়। সম্প্রতি এক বিশ্বসুন্দরীর আত্মহত্যার মধ্য দিয়ে বিশ্ববাসী তা জানতে পেরেছে। ১৯৮৫-এর মিস হাঙ্গেরী সম্প্রতি ঘুমের বড়ি খেয়ে আত্মহত্যা করে পৃথিবীর সৌন্দর্য ব্যাকুল নারী সমাজকে সচেতন করে দিয়ে গেছে। মেয়েটি বেশ কিছুকাল যাবৎ সৌন্দর্য প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে সাফল্যের চূড়ায় উঠতে থাকে। ইউরোপীয় সৌন্দর্য প্রতিযোগিতায় এই মিস হাংগেরী তৃতীয় স্থান অধিকার করেছিল। অর্থ, বিত্ত ও পুরুষের পূজা সে কম পায়নি। চতুর্দিকে খ্যাতি, গুণগান ও প্রলোভন সে কম পায়নি। এত কিছুও তাকে নারীত্বের যে অবসর না হলে হাওয়ার উত্তরাধিকারীরা বাঁচে না সেই বিশ্রাম দিতে পারেনি। ফলে আত্মহননে সে দেহ সৌন্দর্যের অবসান ঘটিয়েছে। মরবার আগে একটা চিরকুট লিখে সে জানিয়ে গেছে খ্যাতির বিড়ম্বনাই তার আত্মহত্যার কারণ।

খবরটা দুঃখজনক ও মর্মান্তিক সন্দেহ নেই। বিশবাইশ বছরে তার জীবন যখন সবেমাত্র শুরু হয়েছে। তখন তাকে ঘুমোতে দেয়নি লোভীর দল। সকলেই তাকে তারিফের তরবারি দিয়ে খুঁচিয়ে মেরেছে। কেউ নিয়ে এসেছে ফুল, কেউ টাকা। কেউ শুধু একটু তার শরীরটা দেখার জন্য জানালার ফাঁক-ফোকরে উঁকি মেরে থেকেছে। তার খাওয়া, ঘুম হারাম হয়ে গেছে। সর্বত্র হায়েনার চোখ তার নারীদেহকে ছিঁড়ে খাওয়ার জন্য তাকিয়ে আছে। লোভ গড়িয়ে পড়েছে বাতাসে। নিশ্বাসের সাথে তা টানতে মেয়েটির বুক নিশ্চয় পাথরের মত ভারী বোধ হত। ফলে এই আত্মবিনাশ।

আহা কত ভাল হত হাংগেরীর মেয়েটি যদি কোনো সুন্দরী প্রতিযোগিতায় নগ্ন হয়ে না দাঁড়াত। যদি সে হত কোনো অখ্যাত গ্রামের কোনো তরুণ কিষাণের বৌ। কেউ, কোনো পাপাসক্ত লোভী নগরবাসী যদি না জানতো তার রূপের কথা, কি এমন ক্ষতি হত সভ্যতাগর্বী দুর্বিনীত মানব জাতির? মেয়েটি হয়ত মা হত কয়েকটি পুত্রকন্যার। সংসারের সুখ-দুঃখের মধ্যে তার নির্ধারিত আয়ু পূর্ণ করে কবরবাসী হত কিংবা সে যদি হত মধ্যপ্রাচ্যের কোনো অখ্যাত দরিদ্র বেদুঈন নারী তাহলেও আব্রুর মধ্যে রয়েছে যে নারীর বিশ্রাম তা সে আস্বাদন করে নিজেকে ধন্য মনে করতো। দেহ প্রদর্শন যে নারীর স্বাধীনতার প্রতিবন্ধক একথা সে ইসলামের আশ্রয়ের মধ্যে মরুভূমির তাঁবুতে ঘুমিয়েও জানতে পারতো। যা তাকে বুদাপেষ্টের সুরক্ষিত ফাইভ ষ্টার হোটেলও দিতে পারেনি। হায়রে সুন্দরী শ্রেষ্ঠা নারীকুল!

১৯/৭/৮৬

www.pathagar.com

যে সত্য দুর্বহ

সম্প্রতি দেশ-বিদেশের পত্র-পত্রিকায় বাংলাদেশের সামাজিক অবস্থার আভ্যন্তরীণ বিষয়াদি নিয়ে এমন সব সংবাদ প্রকাশিথ হচ্ছে-যা পাঠ করে সভ্য জাতি হিসেবে মাথা উচুঁ রাখা যায় না। বাংলাদেশ সম্বন্ধে বিদেশী পত্র-পত্রিকার সব সংবাদই সত্য একথা অবশ্য আমরাও স্বীকার করতে পারি না। তবে মাঝে মধ্যে সামাজিক বিকৃতি সম্বন্ধে এমন সব খবর ছাপা হয়, যা অসত্য বলে উড়িয়ে দেওয়াও মুশকিল।

মনে রাখতে হবে, বিশ্বের মানচিত্রে বাংলাদেশের মত তৃতীয় বিশ্বের ক্ষুদ্র দরিদ্র দেশ বিশেষ কারণ না ঘটলে আন্তর্জাতিক সংবাদ সংস্থাগুলোর দৃষ্টি আকর্ষণ করে না। বিশেষ করে রয়টারের মত প্রবল পরাক্রান্ত সংবাদ পরিবেশকদের কৌতূহল তো সহজ ব্যাপার নয়।

সম্প্রতি মধ্যপ্রাচ্যের একটি ইংরাজী সংবাদপত্রে বাংলাদেশের নারী নিপীড়নের একটি খবর প্রকাশ পেয়েছে। সংবাদটি ঢাকা থেকে রয়টার পরিবেশন করেছেন। সংবাদের শিরোনাম তৈরী করা হয়েছে, "বাংলা মিনিষ্টার সেইজ র‍্যাপ, মার্ডার র‍্যামপ্যান্ট অর্থাৎ বাংলাদেশের মন্ত্রী বলেছেন, তার দেশে বেপরোয়া হত্যা ও ধর্ষণ চলছে। সংবাদটির মূল বক্তব্য হল পার্লামেন্টে এক প্রশ্নোত্তরকালে বাংলাদেশের জনৈক মন্ত্রী কবুল করেছেন যে, তার দেশে ১৯৮৬ সনে ২৯০ জন মহিলার অপহরণের ঘটনা ঘটেছে। সংবাদটিতে দৈনিক ইত্তেফাকের বরাত দিয়ে বলা হয়েছে, গত ফেব্রুয়ারী মাসে মোট ১০টি মেয়ে ধর্ষিত এবং চারজন নিহত হয়।

এ ধরনের সংবাদ মধ্যপ্রাচ্যে বাংলাদেশের মর্যাদাকে ধুলোয় লুটিয়ে দিচ্ছে। আমরা বলি না যে, সংবাদটির কোন সত্যতা নেই। বরং সংবাদটির সত্যতা স্বীকার করেই বলতে চাই, এসত্য অসহ্য, অপমানকর ও জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী। মধ্যপ্রাচ্যে কর্মরত বাংলাদেশের হতভাগ্য প্রবাসীদের জন্য তা অত্যন্ত দুর্বহ ও অসম্মানজনক।

অর্থ উপার্জনের জন্য যেসব বাংলাদেশী বছরের পর বছর মধ্যপ্রাচ্যে আছেন তারা প্রবাসে অন্যান্য বিদেশীদের সাথে সমমর্যাদা ও জাতীয় অহংকার নিয়ে বেঁচে থাকতে চান। আসলে বিদেশে এরাই হলেন বাংলাদেশের সার্বভৌমত্বের পতাকা। এদের আচরণও মানসিক অবস্থা দেখেই বিদেশীরা একটি দেশের সামাজিক শৃংখলা ও সৌন্দর্য উপলব্ধি করতে সক্ষম হন। এরা বাইরে বাংলাদেশ সম্বন্ধে যে ধারণা গড়ে তোলেন এর নিরিখেই বিদেশী রাষ্ট্র বাংলাদেশ সম্বন্ধে একটি অনুমান নির্ভর সামাজিক অবস্থা উপলব্ধি করে এদের সাথে ভালোমন্দ ব্যবহার করে থাকেন।

www.pathagar.com

যে জাতি নারীকে এতটা অবজ্ঞা ও অত্যাচারের মধ্যে রেখেছে, সে জাতির সমাজ ও ধর্মদক্ষতা সম্বন্ধে বিদেশীদের মনে এক প্রকার বিরূপ ধারণা বিরাজ না করে পারে না। অথচ একথাও সত্য, বাংলাদেশের মানুষ তাদের সামাজিক ও ধর্মীয় ব্যবস্থার মধ্যে নারী জাতির প্রতি যথাযথ সুবিচার প্রতিষ্ঠারই পক্ষে। বাংলাদেশ যেহেতু একটি মুসলিম দেশ বলেই মধ্যপ্রাচ্যে পরিচিত, সে কারণেই বিষয়টা সকল বাংলাদেশী মানুষের কাছেই সমানভাবে অপমানজনক। এ অপমান রাখবার কোনো আশ্রয় আপাতত আমাদের সামনে আমরা দেখি না।

প্রকৃত কথা হল, বাংলাদেশে বেপরোয়া নারী নির্যাতন, ধর্ষণ ও হত্যা চলছে। সরকার ও শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের শত সদিচ্ছা থাকা সত্ত্বেও এই দুঃসহ অবস্থার কোনো হেরফের হচ্ছে না। মনে হয়, অপমান ও পেষণের মধ্যে নারীদের রাখাই যেন আমাদের পৌরুষের বাহাদুরী। কিন্তু নারীর যথাযথ মর্যাদা যা শরীয়তসম্মত তা বহুকাল আমাদের মা-বোনদের নিরাপত্তার মধ্যেই রেখেছিল। বাংলাদেশের মেয়েরা শত বৎসরব্যাপী অর্থনৈতিক দুর্গতির মধ্যে বাস করলেও পারিবারিক ইউনিটে ছিলেন পরিবারের কর্ত্রী। বর্তমানে নানাবিধ সামাজিক উৎক্ষেপের ফলে তাদের এই কর্ত্রীত্ব আর তারা ধরে রাখতে পারছেন না। অশিক্ষিত মুসলিম সমাজে অন্তত আমাদের সমাজে মুসলিম মেয়েরা তাদের ধর্মসম্মত ইহজাগতিক অধিকার সম্বন্ধে অসচেতন বলেই নানারূপ বঞ্চনার শিকার হন। তা না হলে পুরুষের কর্তৃত্ব স্বীকার করে ইসলাম নারীর সামাজিক ও পারিবারিক প্রাধান্য যে কঠোরতার সাথে নির্ধারণ করেছে তাতে তাদের পুরুষের উপদ্রবের মধ্যে জীবন কাটানোর বাধ্যবাধকতা থাকার কথা নয়।

এককালে মধ্যপ্রাচ্যে মুসলিম মেয়েরা শিক্ষা-দীক্ষায় পিছিয়ে থাকলেও, চৌদ্দশ বছর ধরে কোরআন-হাদীসে বিঘোষিত নারী অধিকার সম্বন্ধে ছিলেন অত্যন্ত সচেতন। সেখানে পুরুষ প্রাধান্যের মধ্যেও তারা তাদের যৌন ও মাতৃত্বের দেনা পরিশোধে পুরুষ সমাজকে একান্ত বাধ্য রেখেছে। ফলে নারী নির্যাতন কাকে বলে, কিংবা শারীরিক প্রাধান্যের কারণেই তাদের ওপর নির্যাতন, ধর্ষণ ও হত্যার মত মারাত্মক অপরাধ সংঘটিত হয়নি। যদিও হেরেম বন্দিনী হয়ে থাকার কথা আরব্য উপন্যাসে পাওয়া যায়। আরব্য উপন্যাসের সময়কালটা ইসলামী খেলাফতের ধ্বংসের ওপরই স্বৈরতান্ত্রিকভাবে গড়ে উঠেছিল। তবুও ইতিহাস বিশ্লেষণে বোঝা যায় সেই অধপতনের যুগেও নারীর মর্যাদা একেবারেই ধূলায় লুণ্ঠিত হয়নি। অন্তত ইসলামী মূল্যবোধটুকু কোনো না কোনোভাবে তখনও নারীকে মহিমান্বিত করেছে।

সম্প্রতি বাংলাদেশের মেয়েদের নিয়ে বহু ঘটনা সংবাদপত্রের বিষয়বস্তু হয়েছে। কিছুকাল আগে বাংলাদেশ থেকে দালালদের প্ররোচনার মধ্যপ্রাচ্যে চাকরির লোভে পাচার হওয়া কিছু যুবতী ভারতে ধরা পড়ে। বিষয়টা কলকাতা হাইকোর্ট ও সেখানকার নারী কল্যাণ সংস্থা সমূহের আওতায় গিয়ে সারা বিশ্বে মুখরোচক সংবাদ হিসেবে ছড়িয়ে

www.pathagar.com

পড়ায় বাংলাদেশী মানুষ মাত্রই অত্যন্ত লজ্জিত হন। এসব বিষয়ে দেশের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ শেষ পর্যন্ত কি ধরনের ব্যবস্থা নেন, তা অবশ্য আমাদের জানার উপায় থাকে না। কারণ দুর্ণাম নিরসনের পদক্ষেপগুলো সম্ভবত এমন দুর্বল যে তা প্রচারে কর্তৃপক্ষ উৎসাহী নন।

যা হোক, জাতীয় স্বার্থ ও স্বাজাত্যবোধের পক্ষে হানিকর ও এধরনের সংবাদ শেষ পর্যন্ত চাপা থাকে না। চাপা দেওয়া যায় না। এর প্রতিরোধের জন্য এ ধরনের অনাচারেরই মূলোৎপাটন প্রয়োজন। এমন নয় যে নারী-লাঞ্ছনা বন্ধ করার মত কোনো আইন আমাদের প্রশাসনে নেই। আছে, কিন্তু এর প্রকৃষ্ট ব্যবহার বা চর্চা কঠোরতার সাথে করা হয় না বলেই আইনগুলোকে সভ্য দেশের আইন হিসেবে শিথিল মনে হয়। আমরা জানি কঠোরতর আইন প্রণীত হলেই তা শুভ ফল দেয় না। তবে সামাজিক গ্লানি প্রতিরোধ করার জন্য কঠোর দণ্ড একান্ত অপরিহার্য। ইসলাম এই ব্যাপারে অত্যন্ত কঠোর শাস্তিরই পক্ষপাতী। যেনা, নারীর সম্ভ্রম লংঘন ও হত্যার দণ্ড ইসলামী শরীয়ত মোতাবেক প্রণয়নই বাংলাদেশের জন্য একান্ত জরুরী হয়ে পড়েছে বলে আমরা মনে করি।

শুধু আইন নয়, নারীর মর্যাদা প্রতিষ্ঠার উপায় উদ্ভাবনও সামাজিক কর্তব্য। মুসলিম ছেলেমেয়েদের জন্য বিদ্যায়তনের পাঠ্য তালিকায় ইসলামী শরীয়ত সম্বন্ধে কিছু প্রাথমিক জ্ঞান বিতরণের ব্যবস্থা থাকলেও সমাজে নারীর মর্যাদা তরুণ মনে বদ্ধমূল থাকে। সমাজে মা, বোন, খালা,ফুফুর প্রতি একজন তরুণের মনে কর্তব্যবোধ জাগিয়ে দেয়ার সাথে সাথে স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক সম্ভ্রমবোধ সম্বন্ধেও শিশুকাল থেকেই শিক্ষা দেওয়া আমাদের সমাজের জন্য বর্তমানে একান্ত প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। মনে রাখতে হবে, বিশ্বের মুসলিম সমাজ বিশ্বের যেখানে যে অবস্থাতেই অবস্থান করুক, তারা একটি মাত্র উম্মারই অন্তর্ভুক্ত। বাংলাদেশে এর সামান্য হানি ঘটলে তা সারা বিশ্বের মুসলিম উম্মারই লজ্জা ও অনুতাপের কারণ হয়। সকল মুসলমানের বুকেই তা সমানভাবে বাজে।

মধ্যপ্রাচ্যের ইংরাজী দৈনিকে প্রকাশিত সংবাদটির সত্যতা স্বীকার করেই বলা যায়, আমাদের লজ্জা রাখার কোন ঠাঁই নেই। আমাদের সমাজে নারীর প্রতি যে অসম্মানজনক অবস্থা নির্মিত হয়েছে, সকলেরই আন্তরিকভাবে তা প্রতিরোধের জন্য এগিয়ে আসা উচিত। কেন নারীরা এতটা অবজ্ঞার মধ্যে জীবন যাপন করবে? ইতিহাস থেকে এটুকু তো বিবেকবান সভ্য মানুষ জেনে এসেছেন যে, নারীর সম্ভ্রম যখন যে সমাজেই লুণ্ঠিত হয়েছে, সেখানেই নেমে এসেছে আল্লাহর গজব। যেনা, ব্যভিচার ও নির্বিচার নিরীহ মানুষের রক্তের দেনা শুধতে কত সভ্যতা ও শক্তির উৎস ইতিহাসের তমস্যায় আচ্ছন্ন হয়ে ডুবে গেছে, দিগ্বিজয়ী মাটির ভেতরে। হায় তবু কেন মানুষের বোধোদয় হয় না?

১৭/৪/৮৭

www.pathagar.com

জীবনের ছটফটানি

বাংলাদেশের খরাপীড়িত মানুষের আহাজারি, আর্তরোদন ও প্রার্থনায় শেষ পর্যন্ত রোদে পোড়া শুকনো মাটি বৃষ্টির অধিপতি মহান আল্লাহর অপরিসীম করুণায় সিক্ত ও কর্দমাক্ত হয়ে উঠেছে। নমনীয় আকাশে এখন বিদ্যুতের ঘনঘটার মধ্যে তীর্যক গতিতে নেমে আসছে বৃষ্টির ফোঁটা। দারুণ স্বস্তি ও বিশ্বাসে বলবান হয়ে মানুষ এবং প্রকৃতি যেন আড়মোড়া ভাঙছে। এবারের খরা যেন ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিয়ে গেল আল্লাহর অপরিসীম করুণা না থাকলে এই পৃথিবী নামক গ্রহে-প্রাণধারণ এক অসম্ভব ব্যাপার মাত্র। পানি নামক সামান্য একটি উপাদানের অভাবেই জীবনের ছটফটানি কি পর্যায়ে উপনীত হতে পারে তা অবশ্য আমরা অকৃতজ্ঞ মানুষ মুহূর্তেই হয়তো ভুলে যাবো কিন্তু সর্ব ব্যাপারে যেসব আস্তিক আত্মা কেবল আল্লাহর করুণার ওপর নির্ভরশীল তাদের স্মৃতি কখনো তা বিস্মৃত হবে না।

অকৃজ্ঞতা হল মানবজাতির একটি অতি প্রাচীন রোগ। এই রোগের জন্যই কত ভাগ্যহত জাতির উত্থান-পতন ঘটে তা ইতিহাসের অধ্যায় হয়ে আছে। মানুষ সেই ইতিহাস পাঠ করেও সহজে অবনত হতে চায় না। আর চায় না বলেই পৃথিবীর বুকের ওপর নেমে আসে আল্লাহর গজব।

এবার দেশব্যাপী বৈশাখের প্রার্থিত বৃষ্টির অভাবে জনজীবন যখন খাদ্য, পানি এবং শস্যের আশংকায় কাতর ঠিক তখনই বাংলাদেশের ক্লেদাক্ত সমাজ জীবনের পাপ-পংকিল একটি ঘটনা প্রাত্যহিক সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় যেন দৈবের মত উদঘাটিত হয়েছে। রীমা নামক এক গৃহবধূর হত্যাকান্ডের সূত্র ধরে বেরিয়ে এসেছে এমন সব নরনারীর অবৈধ যৌনাচারের ইতিবৃত্ত যারা আমাদের সমাজে ভদ্রলোক ও ভদ্র মহিলার পরিচয়ে অবাধে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। এরাই নিজেদের প্রগতিশীল বলে এবং বস্তুগত ও আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্যের গর্বে দেশের আইনশৃংখলাকে তুচ্ছ জ্ঞান করে এত দিন তাদের আসল চেহারা মুখোশের আড়ালে লুকিয়ে রেখেছিলেন। দৈবাৎ তা উদঘাটিত হয়েছে মাত্র।

আমরা জানি না, আমাদের পুরো সমাজটাই মুখোশ পরে আছে কি না। তবে অর্থ ও বিত্তের বৈভবে গরীয়ান নগরজীবনের প্রতি সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষের আস্থা যে উজাড় হয়ে যাচ্ছে তা আন্দাজ করতে কোনো অসুবিধে হয় না। এখন স্বাভাবিক মানুষকেও কেউ আর স্বাভাবিক মানুষ ভাবতে পারছে না, এটাই হল মানবতার জন্য তথা বাংলাদেশের মত একটা হতদরিদ্র দেশের জন্য মারাত্মক ঘটনা।

সকাল বেলা হকার যখন দরজার ফাঁক গলিয়ে প্রাত্যহিক সংবাদপত্র বিতরণ করে

www.pathagar.com

যায় তখনই দেখি নিজের ছেলে-মেয়েদের একটি মাত্র দুর্ভগ্যজনক সংবাদ পাঠের জন্য নির্লজ্জ ধ্বস্তাধ্বস্তি। কার আগে কে পড়বে-এ নিয়ে আনকোড়া কাজটাকে লণ্ডভন্ড করে ফেলা। এ অবস্থায় মুখ নীচু করে থাকা ছাড়া বিবেকবান অভিভাবক বা পিতামাতা আর কি করতে পারেন? উঠতি তরুণদের একমাত্র আলোচ্য বিষয় হয়ে উঠেছে একটি মাত্র নোংরা ঘটনা যা সমাজের ভদ্রবেশী মুষ্টিমেয় কয়েকটি মানুষের যৌন লোভ-লালসা ও প্রচুর টাকার পাহাড়ের উষ্ণতায় সংঘটিত হয়েছে। এই দরিদ্র দেশে অর্থ ও বিত্তের এমন অসমবন্টন কিভাবে যে সৃষ্টি হয়েছে তা আমাদের মত সাধারণ মানুষ কিছুতেই হৃদয়ঙ্গম করতে পারি না। তবে কি একেই বলে সামাজিক প্রগতি?

আমাদের দেশে এই কিছু দিন আগেও নারীর লজ্জা বলে একটা সামাজিক সম্ভ্রমবোধের অস্তিত্ব আমরা কমবেশী উপলব্ধি করতে পারতাম। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় ঢাকার সাম্প্রতিক সামাজিক পরিবেশে নারীর সম্ভ্রমবোধের সামান্য লক্ষণও সম্ভবত এই মহানগরীতে আর অবশিষ্ট নেই।

এই দেশে নারী প্রগতি নিয়ে যেসব প্রগতিশীল ভাবুকগণ সব সময় দুশ্চিন্তায় কন্টকিত থাকেন তাদের কাছে আমাদের জিজ্ঞাসা বর্তমান সামাজিক পরিস্থিতিতে নারীর সম্ভ্রম রক্ষার কোনো বস্তুবাদী দৃষ্টান্ত কি তারা পেশ করতে পারেন যাতে সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে বিষাক্ত কীটের মত ঢুকে পড়া অবৈধ যৌনাকাংখার সামান্য উপশম ঘটবে?

এক সময় এই শহরের বাঙালি মুসলমান মেয়েরা ছতর ঢাকার জন্য উড়না বা শাড়ি পরার সাবেক সলজ্জ কায়দা আয়ত্তের মধ্যে রেখে রাখঢাক করে চলতেন। তারা কেউ নির্লজ্জ বা বেহায়া ছিলেন না। তবুও তাদের কেউ কেউ উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ, অর্থনৈতিক সংগ্রামে কৃতিত্ব এবং গৃহবধু রূপে সুচারু সংসার যাত্রা নির্বাহ করেছেন।

আজ নারী স্বাধীনতার জন্য যারা উচ্চকণ্ঠ তাদের সামাজিক সংগ্রামটা যে অর্থনৈতিক মুক্তির সংগ্রাম তা আমরা বুঝতে পারি। তবে অর্থনৈতিক মুক্তির সাথে যৌন স্বেচ্ছাচারের প্রশ্নও ওতপ্রোতভাবে জড়িত। যারা পাশ্চাত্যে এই আন্দোলনের হোতা বা হোত্রী তারা নরনারীর যৌন সংশ্রবের পবিত্রতার বিষয়টি ধর্তব্যের মধ্যে আনেননি বলেই সেখানে অর্থাৎ পুঁজিবাদী দুনিয়ায় নারীর দৈহিক কমনীয়তাকে পণ্য হিসেবে বিজ্ঞপতি ও ব্যবহার করা হয়েছে। ইউরোপে সতীত্বের কোনো সমস্যা নেই, কারণ বর্তমান পাশ্চাত্য সমাজে সব নারীই তাদের বিবাহপূর্ব কৌমার্যকে একটা হাস্যকর কুসংস্কার ছাড়া আর কিছু ভাবে না।

নিউ টেস্টামেন্ট বা ওল্ড টেস্টামেন্ট কোথাও নারীকে ব্যভিচারিণী হওয়ার ব্যাপারে উৎসাহ দেয়নি। যত দিন পর্যন্ত এরা সেন্ট পল প্রচারিত বেঠিক খৃষ্ট ধর্মেরও অনুগত ছিল এবং খৃষ্টান সমাজ বলে একটা ধর্মীয় পরিবেশের বাধ্যবাধকতার মধ্যে ছিল ততদিন পর্যন্ত এদের নারীরা মোটামুটিভাবে বিবাহ, পরিবার এবং সন্তানের মা হিসেবে সমাজে তাদের যোগ্য ভূমিকা খানিকটা পালন করে গেছেন। কিন্তু শিল্প বিপ্লব ও

www.pathagar.com

ব্যাপক কলকারখানা বিস্তারের যুগে প্রবেশ করে এরা নারীকে ঘরের বাইরে টেনে এনে তার শ্রম ও সৌন্দর্য এ দু'টি প্রধান গুণকেই বিক্রয়যোগ্য পণ্যে পরিণত করে। আর বর্তমানের সবচেয়ে প্রবল ধনবাদী সমাজ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সামাজিক মানসিকতা এমন এক পর্যয়ে পৌঁছেছে যেখানে একজন নারীর বিক্রয়যোগ্য কোনো গুণ তার দেহে বা বাহ্যিক প্রদর্শনে গ্রাহ্য না হলে তাকে মানুষই মনে করা হয় না। এদের প্রধান প্রশ্ন হল আপনার কাছে বস্তুগত অথবা দেহগত বিক্রি করার মত কোনো প্রযুক্তি বা লাবণ্য আছে কিনা মুহূর্তে যা বাজারজাত করা সম্ভব। না থাকলে মার্কিন মুল্লুকে আপনার ঠাঁই নেই।

পুঁজিবাদী পাশ্চাত্যে নারী যে পণ্য সামগ্রী মাত্র একথা যুক্তি ও নানারূপ অর্থনৈতিক সূত্র উত্থাপন করে প্রথম সার্থকভাবে প্রমাণ করেন কার্ল মার্কস তার নানা প্রবন্ধে। নারীর রূপ-যৌবনকে ধনবাদী সমাজের শোষক ও সুবিধাপ্রাপ্ত শ্রেণীর ভোগীরা কে কিভাবে দামদর করে বিবাহের ভাঁওতায় নিজের দখলে রাখতে পারঙ্গম ছিলেন তা তিনি বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন এবং এই অবস্থা থেকে নারীকে মুক্ত করার সমাজবাদী পন্থা বাতলিয়েছেন। সেই পন্থা কম্যুনিস্ট ইস্তাহারের সেই বিখ্যাত উক্তি যাতে বলা হয়েছে ভবিষ্যতে বিবাহের আর প্রয়োজন থাকবে না। সেই সাম্যবাদী সমাজে নারী তার পছন্দমত এক বা একাধিক পুরুষ-সঙ্গী গ্রহণ করবেন। সন্তানের পিতৃপরিচয়েরও কোনো প্রয়োজন থাকবে না। কারণ সমাজের সকল পুরুষই হল শিশুটির পিতা এবং সকল মা-ই হবেন শিশুটির মাতা, রাষ্ট্র সন্তানের ভরণপোষণের দায়িত্ব গ্রহণ করবে। কার্ল মার্কসের এই স্বপ্ন অর্থনৈতিক অথবা রাজনৈতিকভাবে পৃথিবীর কোথাও এখনও প্রবর্তিত হয়নি। যেসব দেশে কম্যুনিস্টগণ শাসন ক্ষমতায় আছেন তারাও বিবাহ প্রথা তুলে দিতে এখনও পূর্ণভাবে সাহসী হননি। এখনও কম্যুনিস্টদের রাজ্যে আর যাই হোক নারীমাংসের লোলুপতা সহ্যের সীমা অতিক্রম করে যায়নি। যদিও বেশ্যাবৃত্তি প্রতিরোধের জন্য কাল মার্কস এতটা আগুয়ান হয়ে নারীকে সমাজের সর্বসাধারণের সম্পত্তির পর্যায়ে নামিয়ে আনতে কসুর করেননি।

মার্কসের তত্ত্ব সমাজতন্ত্রী বা কম্যুনিস্টরা অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালন করতে না পারলেও মার্কস ও শ্রমিক শ্রেণীর প্রধান এবং অস্তিমশত্রু পুঁজিবাদীরা কিন্তু প্রয়োগ করে সার্থক হয়েছে। তারা পাশ্চাত্য সমাজের বড় বড় পুঁজিবাদী শহর যেমন প্যারী, লন্ডন, ওয়াশিংটন ও নিউইয়র্কের আলো ঝলমল আবেস্টনীর মধ্যে নারী-পুরুষের এক নতুন ধরনের সংসার যাত্রা নির্বাহের আইনগত সুবিধা সৃষ্টি করেছেন। এই সুবিধাকে বলা হয় 'লিভিং টুগেদার' বা এক সাথে কালযাপন। অর্থাৎ বিবাহের বাধ্যবাধকতা ছাড়াই দু'জন নরনারীর স্বামী-স্ত্রীর মত একঘরে এক বিছানায় বসবাসের অধিকার। জারজ উৎপন্ন হলে তা রাষ্ট্রীয় এতিমখানার দায়-দায়িত্বে রেখে যুবক-যুবতীর যৌন সুখ উপভোগের অধিকার ইত্যাদি। মার্কসীয় যে সমাজে এই মজা লোটার তাত্ত্বিকতা রয়েছে তারা কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা কার্যকর করতে পারেননি। কিন্তু তাদের শত্রু পুঁজিবাদীরা তা

www.pathagar.com

যথাযথভাবে কার্যকর করে পুঁজিতান্ত্রিক সুবিধার ফায়দা অকাতরে লুটে নিতে চাইছে। একেই বলে প্রগতিশীলতায় সার্বজনীন অধিকার।

যা হোক, আমাদের দেশে নারী স্বাধীনতার প্রবক্তারা সাম্যবাদের তকমা আঁটা পাশ্চাত্যের পুঁজিবাদীরই অসচেতন দালালীতে নেমেছেন। তারা নারীর অর্থনৈতিক মুক্তির নাজুক প্রসঙ্গ তুলে তাদের ঘরের বাইরে টেনে আনার আন্দোলনে একটি পশ্চাৎপদ মুসলিম দেশের মেয়েদের সর্বনাশ সাধনে তৎপর হয়ে উঠেছেন। তারা অবলম্বন করেছেন তৃতীয় বিশ্বের সবচেয়ে দরিদ্র দেশের নারীপীড়নের বিরুদ্ধে সোচ্চার সাধারণ যুক্তি যা কারোরই অজানা নয়। কাম্যও নয়। তবুও এখনই তারা নারীকে অর্থনৈতিক অসহায়তার যুক্তি তুলে উদোম দেহে রাস্তায় এনে দাঁড় করাতে উন্মাদ।

আজ যে মেয়ে বুকের ওপর আর উড়না রাখতে চায় না অচিরকালের মধ্যেই তার মেয়েরা প্রায় অর্ধউলঙ্গ হয়ে দেহ প্রদর্শনের স্টাইল আবিষ্কার করবে।

তবুও একটা কথা এখানে বলা দরকার। ঢাকা অন্যান্য মুসলিম শহরের মতই একটি শহর। এ শহরের নারীদের ইহুদী, খৃস্টান অথবা হিন্দু নারীর অনুকরণে পোশাক-পরিচ্ছদ ও সমকালীন ফ্যাশন নির্বাচন করলে চলবে না। তাদের মুসলিম নারীর মর্যাদাপূর্ণ ফ্যাশন গ্রহণ করেই বেঁচে থাকতে হবে।

আমাদের সমাজপচনের সামান্য লক্ষণমাত্র সাম্প্রতিক রীমা হত্যা মামলায় উদঘাটিত হয়েছে। কে জানে আমাদের বিত্তশালী পরিবারগুলোর অভ্যন্তরে কি ধরনের পুঁজ জমে আছে?

২/৫/৮৯

www.pathagar.com

নারী পাচার

বাংলাদেশে মানুষের শ্রমের মূল্য অত্যন্ত কম। সম্ভবত অনুন্নত দেশের শ্রমজীবীদের মধ্যে একমাত্র বাংলাদেশের গায়ে খাটা নর-নারীই উদয়াস্ত পরিশ্রম করেও দু'বেলা পেট ভরে খাওয়ার সংস্থানও করতে পারে না। এই যেখানে অবস্থা সেখানে মানুষের প্রাণের দামও কম হতে বাধ্য। আর যেখানে প্রাণও কানাকড়ি মূল্যে কেড়ে নেয়া যায়, সেখানে নারীর ইজ্জত নিয়ে কে আর মাথা ঘামায়! আমরাও মাথা ঘামাতাম না যদি বাংলাদেশ, একটা অন্যতম মুসলিম দেশ না হত। দলে দলে মুসলিম যুবতীদের চাকরির লোভ দেখিয়ে মুষ্টিমেয় কয়েকটি নরপশু ভারতে পাচার করছে। পাচারকৃত মেয়েরা দালাল ও নারীমাংস লোভী পাষণ্ডদের খপ্পরে পড়ে এই উপমহাদেশের ঘূর্ণিপাকের মধ্যে কে কোথায় ছিটকে পড়ছে, কে কি ধরনের জীবন কাটাচ্ছে দেখার মত কোনো ব্যবস্থা বা উপায় আমাদের নেই। মাঝে মধ্যে ভারতীয় পত্র-পত্রিকার দৌলতে পাচার হয়ে যাওয়া বাংলাদেশের যুবতী ও শিশুদের মর্মান্তিক জীবন যাপনের অশ্রুরুদ্ধ কাহিনী আমাদের কাছে এসে পৌঁছালে আমরা একটু-আধটু হাহুতাশ করি বটে কিন্তু নারী পাচারের স্রোত বন্ধ করার কোনো উপায়ই ভেবে পাই না। অথচ মানবাত্মার এই অপচয় ও নারী লাঞ্ছনার এই উন্মত্ততাকে প্রতিরোধ করা, আমরা মনে করি দেশের প্রত্যেকটি নাগরিক এবং সমাজের বিবেকবান মানুষের একান্ত কর্তব্য।

মানুষ বেচে অর্থ উপার্জন করা এ দেশের একদল বিবেকহীন মানুষের পশুপ্রবৃত্তিতে পরিণত হয়েছে। এ ধরনের মানুষ বিক্রিকারী আজকাল এতটাই বেপরোয়া হয়ে উঠেছে যে, এরা এখন গ্রাম-জনপদ উজাড় করে শহরের নিরুপায় পরিবারের বেকার যুবতীদের দিকেও হাত বাড়াচ্ছে। এদের প্রলোভন বিস্তারের কলাকৌশল সম্বন্ধে আমরা সঠিকভাবে অবহিত না হলেও, এরা যে অসাধারণ ধড়িবাজ তা বুঝতে অসুবিধা হয় না। এদের মায়াবী প্রলোভনে ভুলেই এতদিন গ্রামাঞ্চলের সরল যুবতী ও কিশোরীরা, যাদের ভারত-বাংলাদেশের সীমান্তরেখা এবং রাজনৈতিক ভূগোল সম্বন্ধে কোনো সুস্পষ্ট ধারণা নেই, তারা শুধু পেটের দায়ে একটি খেটে খাওয়ার মত কাজ পাবার আশায় নারী পাচারকারীদের শিকার হয়েছে। আর ঐসব মেয়েরা ভারতের নারী পাচারকারী চক্র এবং পাকিস্তানী নারী পাচারকারীদের তৎপরতায় হাত বদল হতে হতে শেষ পর্যন্ত এই উপমহাদেশের বিভিন্ন খ্যাত অখ্যাত শহর-নগরের বেশ্যালয় গুলোকে পূর্ণ করে তুলছে এবং পাপ- পংকিলতার মধ্যে বাকী মানবজীবনটা কাটিয়ে দিতে বাধ্য হচ্ছে।

www.pathagar.com

সম্প্রতি একটি দৈনিক পত্রিকায় দালালদের প্ররোচনায় বাংলাদেশের বেশ কিছু যুবতীর চাকরির লোভে অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশের প্রতিফলস্বরূপ ভারতের রাজস্থানে গ্রেফতার এবং ভারতীয় নিরাপত্তা রক্ষীদের দ্বারা ধর্ষিতা হওয়ার এক চাঞ্চল্যকর সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে। এই খবরেই জানা গেছে, শত শত যুবক-যুবতী বর্তমানে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের জেলে এক হতাশ্বাস মানবেতর জীবনযাপনে বাধ্য হচ্ছে। এদের উদ্ধারের যেমন কেউ নেই তেমনি চাকরির লোভে অবৈধভাবে দেশ ছেড়ে যাওয়ার প্রলোভনকে শায়েস্তা করারও তেমন উপযুক্ত কঠোর ব্যবস্থা সরকারীভাবে গৃহীত হচ্ছে না। আমরা মনে করি ভারতের সাথে আমাদের বিস্তীর্ণ সীমান্ত রেখার জন্যই সরকারী প্রতিরোধ এবং প্রতিকার প্রক্রিয়া ঐসমস্ত অবৈধ অতিক্রমকারীদের প্রদমিত রাখার প্রধান বাধাস্বরূপ। এই অবস্থার হাত থেকে দেশের গ্রাম্য বেকার যুবতীদের বাঁচাতে হলে এমন একটি ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে যাতে এদেশের গ্রামে-গঞ্জে অবৈধ প্রবেশকারীদের লাঞ্ছনা, অপমান এবং অন্যবিধ অমানবিক দুঃখ-কষ্টের কথা অশিক্ষিত গ্রামবাসী জানতে পারে।

আমাদের দেশ বেকারত্বের অভিশাপে জর্জরিত। এই অভিশাপ শুধু যে শহরেই বিরাজমান এমন নয়। ভূমিহীন চাষীদের ঘরে ঘরে এই কাজ না পাওয়ার এবং অভুক্ত থাকার জ্বালা। এই জ্বালায় ইজ্জত-আব্রুর কথা, ভবিষ্যত পরিণামের কথা চিন্তা না করেই অল্প বয়েসী কিশোরীরা অজানার পথে কাজের লোভে পা বাড়ায়। তারা অবশ্য কাজ করেই খেতে চায়। কিন্তু মানুষ বিক্রির দালালেরা তাদের অসহায়তার সুযোগ নিয়ে তাদের দেহ বিক্রির, দেশ বিক্রি এবং সর্বোপরি ধর্ম অর্থাৎ ঈমানকে বিকিয়ে দেয়ার দুঃসহ পথে ঠেলে নিয়ে যায়।

আমরা মনে করি, গ্রাম-জনপদের ভূমিহীন কিষাণ পরিবারের মেয়েদের চাকরির প্রলোভন বিস্তারকারী দালালদের ফুসলানোর হাত থেকে বাঁচানোর জন্য দলমত নির্বিশেষে সকল রাজনৈতিক দল ও সমাজ সেবকদের সচেতন প্রতিরোধ তৈরী করার সময় এসেছে। দেশের সরল যুবতীরা যখন কেবল তাদের অজ্ঞানতার জন্য পরদেশে গিয়ে লাঞ্ছিতের জীবন-যাপন করতে বাধ্য হয়, তখন দেশের গৌরব, উন্নতি, সংস্কৃতি এবং স্বাধীনতা নিয়ে দর্প করার অবকাশটা কোথায় থাকে? শুধু যে রাজনৈতিকভাবেই এর বিরুদ্ধে জনমত সৃষ্টি করা উচিত এমন নয় ধর্মীয়ভাবেও নারী পাচারের বিরুদ্ধে মোটিভেশন তৈরী করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। আমরা মনে করি, অবৈধভাবে পরদেশে প্রবেশের লাঞ্ছনার চিত্র যদি ধর্মীয় ব্যক্তিরা তাদের ওয়াজ নসিহতে ব্যক্ত করতে শুরু করেন তবে কোনো সুচতুর দালালেরও সাধ্য নেই বাংলাদেশের মুসলিম কিষাণ পরিবারের যুবতীদের ভারতে কিংবা পাকিস্তানে চাকরির লোভে প্রলুব্ধ করে নিজেদের গ্রাম থেকে এক পা বাইরে আনতে পারে।

একটু খোঁজ নিলেই জানা যাবে, যেসব মেয়ে দালালের খপ্পরে পড়ে সীমান্ত

www.pathagar.com

অতিক্রম করেছে তাদের অবৈধভাবে দেশের সীমানা পেরুনো সম্বন্ধে কোনো ধারণাই নেই। তাদের বোঝানো হয় কলকাতা বা করাচী গেলেই ডজন ডজন চাকরি এবং সুযোগ-সুবিধা তাদের জন্য অপেক্ষা করেছে। কলকাতা বা করাচী যে কোথায় তা ঐ সব গ্রাম্য অশিক্ষিত মেয়েরা জানে না। তাদের অশিক্ষা ও অজ্ঞতার সুযোগ নিয়েই দালালরা তাদের ফুসলিয়ে স্বগ্রামের বাইরে নিয়ে আসে এবং সীমান্ত অতিক্রম করে অন্য দালালের কাছে নগদ মূল্যে বিক্রি করে দেয়। গরু-ছাগলের প্রতি সাধারণ মানুষ যেটুকু দায়িত্বজ্ঞান এবং দয়ামায়ার পরিচয় দেয় দালালরা ঐসব হতভাগিনীদের প্রতি অতটুকু মনুষ্যত্বেরও পরিচয় দেয় না। এরা সীমান্ত পেরিয়ে এক অসহনীয় নরকের অন্ধকারে চিরকালের মত তলিয়ে যায়।

এধরনের পাচার বন্ধ করার জন্য সরকার যে কোনো উদ্যোগ নিচ্ছেন না তা অবশ্য ঠিক নয়। তবে সরকারী উদ্যোগ সত্ত্বেও নারী ও শিশু পাচার বন্ধ নেই। যেসব দালাল নারী-শিশু পাচারকারী হিসেবে কোনো কারণে আইন-শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষের হাতে ধরা পড়ে যায় শুনেছি প্রমাণাভাবে তাদেরকেও উপযুক্ত সাজা দেওয়া সম্ভবপর হয় না।

আমরা মানুষ বিক্রিকারী নরাধমদের উপযুক্ত সাজা দেয়ার পরিবেশ ও আইনকানুন সৃষ্টির অনুরোধ করি। আর চাকরির প্রলোভনে সীমান্ত অতিক্রমের সকল প্রকার প্রয়াসকে নস্যাৎ করার জন্য সীমান্তরক্ষীদের সতর্ক ও কঠোর হতে পরামর্শ দিই। আমরা জানি আমাদের সীমান্তরক্ষিগণ এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় সতর্কতা নিয়েই আছেন। তবুও যেহেতু নারী পাচারকারীরা অত্যন্ত বেপরোয়া ও শেয়ালের ধূর্ততাকে আয়ত্ত করেছে যে কারণে এদের সাথে মানুষের মত আচরণ করার প্রয়োজন দেখি না।

মনে রাখতে হবে পাচারকৃত বাংলাদেশের অসহায় মেয়েদের সাথে আমাদের জাতিগত মান-ইজ্জত ও ধর্মীয় ভরমও পাচার হয়ে যাচ্ছে। আর পাচারকারীদের কোন্‌টা স্বদেশ আর কোন্‌টা বিদেশ সে জ্ঞান অতি অল্পই থাকে। এদের কাজই হল মানুষের আস্থাকে এদিক-ওদিক বিক্রি করে দেয়া। প্রকৃতপক্ষে এদের কোনো দেশ নেই। এরা উপমহাদেশের প্রতিটি স্বাধীন মানচিত্রেরই পরম শত্রু। এই শত্রুদের ধর্মীয় ফতোয়া দ্বারা প্রতিরোধ করার সময় এসেছে।

৩/১৮/৮৯

www.pathagar.com

মানুষ-নারী শুধু দেহ-সর্বস্ব নয়

বাংলাদেশের নারীশক্তি সন্দেহ নেই এক প্রচন্ড সামাজিক শক্তি। এই প্রচণ্ডতা সংঘবদ্ধ হলে আমরা বিশ্বাস করি একদিন নারীরা বাংলাদেশের রাজনীতিতেও এক বিপুল ব্যাপকতা নিয়ে এদেশের অনেক সমস্যার মূলোৎপাটন ঘটাতে সক্ষম হবেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় শুরুতেই মমতাময়ী মাতৃশক্তিকে বিপথে পরিচালনার জন্য পাশ্চাত্য পুঁজিবাদের দালাল, তথাকথিত সমাজতন্ত্রের প্রবক্তা বিশেষ এক শ্রেণীর রমণীকুল এবং দেশের সাংস্কৃতিক প্রমোদবাদীরা আপ্রাণ চেষ্টা ও ষড়যন্ত্র চালিয়ে যাচ্ছে। নারী স্বাধীনতার নামে তারা লজ্জাশীলা তরুণী, মাতা, বধূদের ঘরের বাইরে প্রমোদক্ষেত্রে, মঞ্চে, টেলিভিশন বিজ্ঞাপনে টেনে আনার চেষ্টায় খানিকটা সফলও হয়েছে। এতে খুব সামান্য পরিমাণে হলেও দুনিয়ার একটি অতিশয় ঘন জনবসতিপূর্ণ মুসলিম এলাকার সামাজিক আচরণে বৈপরীত্য সৃষ্টি হয়েছে। পাশ্চাত্য পারিবারিক পরিবেশ যেসব কারণে এর মধ্যেই বিষাক্ত ও বিপর্যস্ত হয়ে মুক্তির অন্য কোনো নতুন দিগন্ত খুঁজে বেড়াচ্ছে, ঠিক সেই মুহূর্তে বাংলাদেশের নারীবাদীরা আন্তর্জাতিক নারী দিবসের শ্লোগান হিসেবে বেছে নিয়েছে এমন এক কদর্য দাবী যার জন্য নারী মাত্রেরই লজ্জায় মুখ লুকোবারও জায়গা থাকছে না।

আমাদের দেশের নারীবাদীরা মূলত নারীর প্রধান সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করেছে তাদের শরীরকে। শরীরের যত রকম ব্যবহার এবং বেহায়ামি তাদের জানা আছে সম্ভবত ছাপোষা, অর্থনৈতিক সংগ্রামের নিঃসঙ্গ ক্লান্ত যোদ্ধা হতভাগ্য পুরুষ মানুষদেরও তত প্যাঁচ জানা নেই। লেহাজ-লজ্জা একটু কম হলেও শরীর-টরীর নিয়ে পুরুষের তত মাথা ব্যথা নেই। তবে শরীরের স্বাধীনতার কথা শুনলে তারাও একটু বিব্রতবোধ করে বৈকি! হাজার হোক বাংলাদেশটাতো আর ইউরোপ-আমেরিকার মানচিত্রে অবস্থান করে না। তাছাড়া ইউরোপ আমেরিকার নারী বিষয়ক গবেষকরাও যে কথা বলতে এখনও ঠিকমত সাহসী হয়ে ওঠেননি সে কথা বাংলাদেশের মত একটা আধা-সামন্ততান্ত্রিক এবং আধা-পুঁজিবাদী দেশে ওঠে কি করে? এদের পেছনে কারা আছে? কি তাদের উদ্দেশ্য? তারা কি নারীর মূল সমস্যা থেকে তাদের সম্পূর্ণ এক বিপরীত পথে পরিচালিত করতে গিয়ে হিতাহিত জ্ঞান পর্যন্ত হারিয়ে ফেলেছেন? তারা কি ভাবেন তারা এদেশের সব মেয়েকেই তসলিমা নাসরিনে পরিণত করতে সফল হবেন?

'শরীর আমার সিদ্ধান্ত আমার' শ্লোগানের উদগাতাদের বোঝা উচিত পাশ্চাত্যের সমাজ গবেষকগণ নারীদের অনেক ঠমক বা স্বাধীনতা নিয়ে বিশ্লেষণ করলেও শরীর

www.pathagar.com

আমার সিদ্ধান্ত আমার 'পর্যায়ে উপনীত হতে একটু' দ্বিধা করছেন, সেখানকার নারীবাদীদেরও শ্লোগান সম্ভবত এতটা মুক্তকচ্ছ নয়। শরীর আমার সিদ্ধান্ত আমার পর্যন্ত পৌঁছুবার আগে তারা বিশ্লেষণ করে দেখেছেন নারী শরীর অতটা স্বাধীনতা ভোগের তেমন উপযোগী নয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে, শরীর নারীর হলেও তা সর্বক্ষণ নিজের বশে থাকে না। পুঁজিবাদী সমাজের খোলা বাজারে দুর্বল দেহধারিণীর চিত্ত নিজের বশে ধরে রাখা বড়ই মুস্কিল। বরং বাজার অর্থনীতির ধূর্ত কেনাবেচার ফড়িয়াদের বশবর্তী হয়ে পড়ে। ঐসব শেয়ালদের প্রধান হুক্কাহুয়াই হলো দেহ ছাড়া আর সবি মিথ্যে। শরীর ছাড়া শান্তি নেই। মেয়েদের আত্মা বলে যে একটা পদার্থ আছে, সম্ভ্রম বলে আল্লাহ প্রদত্ত একটু লজ্জা বা পবিত্রতা আছে, তা তারা স্বীকার করতে ভয় পায়। আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের মত হাড়-হাড্ডি উন্মোচনকারীরাও শেষ পর্যন্ত এ বিধান দিতে পারেনি যে, শরীর যার সিদ্ধান্ত তারই হবে। তাহলে মানসিক রোগীতে সারা দেশ একটা পাগলা গারদে পরিণত হবে মাত্র। শরীর যারই হোক, সিদ্ধান্ত হবে শরীর যিনি নির্মাণ করেছেন সেই মহান সৃজনবিনাশকারী আল্লাহর। দুর্বল চিত্ত এবং সর্বত্র বিহারের সম্পূর্ণ অনুপযোগী শরীরের আরক্ষার জন্য তিনি আবরণের বিধান দিয়েছেন। শয়তানের শ্যেনচক্ষু থেকে ঢাকো নিজেকে। নিজের অধিকারের সীমা লঙ্ঘন করে সর্বত্র বিহারী হলে তোমার কোনো ঘর থাকবে না। পরিবার, পুত্র-কন্যা, স্বামী সংসারহীন শরীর অশান্তির একটি অগ্নিকুন্ড মাত্র। আর আগুনের স্বাধীনতা কেবল দোজখ তৈরী করে। তোমরা পরিবারকে লেলিহান নরকে পরিণত করো না।

সম্ভবত শরীরের স্বাধীনতা ছাড়া আর কিছু চাওয়ার নেই। এতে বোঝা যায়, এক অতিশয় দেহসর্বস্ব পেগান ধারণা ছাড়া এরা নারী বিষয়ে আরও অধিক অগ্রসর ধারণা সম্বন্ধে মূলত অজ্ঞ এবং অন্ধও বটে। অথচ বিশ্বের একশ বিশ কোটি মুসলিম অধিবাসী পুনর্জাগরণের জোয়ারে একবারও কেউ এ কথা উত্থাপন করেননি, মুসলিম নারী সমাজের শরীর সমস্যা সমাধানের জন্য সিদ্ধান্ত কিতাব বহির্ভূত কোনো কারণের কাছে ছেড়ে দিতে হবে কিনা? পুঁজিবাদী সমাজে যেখানে নারীদেহ ও নারীর রূপলাবণ্যকে নির্দ্বিধায় পণ্যসামগ্রীতে পরিণত করা হয়েছে। নারীর সমস্ত মহত্তর গুণাবলীকে পরিণত করা হয়েছে ছলাকলা ও ছেনালিপনায়। অবগুণ্ঠিত লাবণ্য যেখানে উন্মুক্ত হয়ে পড়েছে পণ্যের বিজ্ঞাপনে। সেখানে মুসলিম মেয়েদের পর্দা নামক একটি সম্ভ্রমপূর্ণ নরম সহনীয় পোশাকই তাদের যুগ যুগ ধরে অলৌকিকভাবে রক্ষা করে এসেছে। এদেশের নারীবাদীরা তাদের শরীর উন্মুক্ত কে করার দাবী ও সিদ্ধান্ত নিয়ে যতই মাঠ গরম করার চেষ্টা করবে ততই এদেশের মুসলিম মাতৃকুল শরীর ঢেকে তাদের পার্থিব সকল সমস্যা নিয়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবে।

ইতিমধ্যেই 'শরীর আমার সিদ্ধান্ত আমার' শ্লোগান নিয়ে দেশের মাতৃকুল দারুণ ধিক্কার ধ্বনি উচ্চারণের সাথে সাথে এর ষড়যন্ত্রমূলক কদর্যতার সমালোচনা শুরু

www.pathagar.com

করেছেন। তারা বলছেন, যারা শরীর আমার সিদ্ধান্ত আমার শ্লোগান তুলেছেন পত্রিকায় তাদের নাম পড়ে আমরা অবাক। সব নামই মুসলিম মেয়েদের নামের মত। শরীরের সিদ্ধান্তবাদীরা এদেশের বিপুল মাতৃসমাজের সাথে পরামর্শ না করে আন্তর্জাতিক নারী দিবসে মুসলিম সমাজধর্ম ও আওরতের শান্তি-শালীনতা বিরোধী এক কদর্য বিষয় উত্থাপন করে মহামাতৃকুলকে উপহাস্য করে তুলেছেন। মুসলিম মেয়েরা ঐসব শরীরবাদিনীদের উচ্ছৃঙ্খল আচার-আচরণ ও আন্দোলনের সাথে সম্পর্কহীন। মুসলিম মেয়েরা বর্তমানে নানা সামাজিক উৎপীড়নে জর্জরিত বটে এবং এর প্রতিকারের চেষ্টাও তারা আল্লাহপ্রদত্ত বিধান অনুযায়ীই করতে সচেষ্ট আছেন। বিশ্বের ইসলামী দেশগুলোর স্বাধীন খাওতীনগণ মুসলিম নারীমুক্তির জন্য যে আন্দোলন সৃষ্টি করেছেন, ঐ পথেই নারী তার আল্লাহ প্রদত্ত অধিকার ভোগ করবে। যেসব শরীরবাদিনীরা মুসলিম নারীদের দেহসর্বস্ব ভোগবাদের দিকে টেনে নিতে চায় তারা শয়তানের সহচরী মাত্র। তাদের কথায় বাংলাদেশের মুসলিম নারী সমাজ কান দেবে না। যেমন কান দেয়নি আরব, পাকিস্তান, ইরান, আফগানিস্তান, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, মরক্কো ও সিরিয়ার মুসলিম মেয়েরা। যারা শয়তানের প্ররোচনায় পড়ে পাশ্চাত্য সমাজের নারী স্বাধীনতার উন্মত্ত সজ্জা ধারণ করেছিল সেই তুরস্ক ও আলজিরিয়ার মেয়েরাও এখন মুসলিম আওরতের মর্যাদা বুঝতে শুরু করেছে। তারাও হিজাবের রক্ষা কবচের মধ্যেই নিজেদের নিরাপত্তা খুঁজে পাচ্ছে। কারণ তারা 'শরীর আমার সিদ্ধান্ত আমার' -এর স্বাদ যে তিক্ত এবং অসহনীয় সেই অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ।

শরীরবাদিনীরা সাংবাদিক সম্মেলনে তাদের আসল উদ্দেশ্য লুকিয়ে অনেক চমকপ্রদ কথাবার্তা বলেছেন। তারা বলেছেন, মানুষ নারীর চেয়ে নাকি নারীর শরীরই মুখ্য। তাই যদি হবে তবে প্রেম, ভালবাসা, দয়াময়া, স্নেহ, সেবা ও মাতৃত্ব কোথায় বাস করে? আমরা তবে যাকে মা বলে সম্বোধন করি কিংবা প্রিয়তমা বলে? তিনি কি কেবল একটি শরীর মাত্র? আর কিছু নন?

শিল্পে-সাহিত্যে নাকি নারীর দেহ, নারীর রূপ কেবলই প্রধান উপাদান। এর চেয়ে ডাহা মিথ্যা ভাষণ আর কি হতে পারে? শিল্প-সাহিত্যের প্রধান উপাদান হলো নারীর মনন। সমাজের সম্বন্ধসূত্রগুলো নারীর মননশীল আচরণের বিশ্লেষণেই পঞ্চমুখ। তে ভোগবাদী সমাজে নারীর রূপ যৌবনকে নিযে যে লীলাখেলা চলে লেখক-শিল্পীগণ সেটাই উন্মুক্ত করে সমাজের বিবেককে জাগ্রত করতে চান মাত্র। শিল্পী-কবিগণ জানেন, নারীর প্রেম, দয়ামায়া, মাতৃত্ব ও সহ্যগুণ ছাড়া মানবগোষ্ঠী মূলত নিরুপায়। একমাত্র শয়তানই শরীর ছাড়া মাতৃত্বের আসল রূপ আড়াল করে রাখতে চায়। নারীর রূপ যৌবনের পরিধি এক যুগও স্থায়ী নয়। অথচ মা, বোন, প্রিয়তমার যে নারী মাহাত্ম্য তা চিরস্থায়ী। নশ্বর ছাড়িয়ে তা অনন্তের দিকে ধাবমান।

১১/৩/৯৪

www.pathagar.com

তসলিমার ব্যাপারে বাইরের হস্তক্ষেপ

তসলিমা নাসরিন নামক আপদটি যে ভারতীয় মিডিয়ার সৃষ্টি এখন এ ব্যাপারে কলকাতার বুদ্ধিজীবী মহলের দু একজন মুখ খুলতে শুরু করেছেন। কেউ কেউ বেশ অবাক হয়েছেন তসলিমার মত এক অপরিপক্ক লেখিকাকে নিয়ে কি করে এমন বিশ্বব্যাপী হৈ চৈ শুরু হতে পারে? কেউ আবার হঠাৎ চমকে গিয়ে বলছেন, আরে এর রচনায় তো প্রকৃতপক্ষে কোনো সাহিত্য মূল্যই নেই। কারো ধারণা, এতো কেবল পবিত্র কুরআন এবং মুসলমানদের ধর্মীয় নীতিবোধকে এলোপাথাড়ি আক্রমণ করেই সর্বত্র গন্ডগোল পাকিয়ে তুলেছে। তসলিমা জেনে গেছে যে, এ পন্থায় যত অর্থ ও আদর পাওয়া যাবে সৃজনশীল সাহিত্যকর্মের সারাজীবনের রোজগারে এর ছিটেফোঁটাও জুটবে না। অতএব স্বধর্মের যতটা কুৎসা প্রচার করা যায় ঠিক ততটাই সুখ্যাতি অর্জিত হবে ভারতের এবং পাশ্চাত্য মিডিয়ার দৌলতে। তাছাড়া আছে লেখকের স্বাধীনতার বুলি, পাশ্চাত্য ও ভারতীয় নাস্তিক ও তথাকথিত মানবতাবাদীদের উচ্ছ্বসিত সমর্থন। এমন একটা মওকা তসলিমার মত ধূর্ত সুবিধাবাদী মেয়ে কি করে পরিত্যাগ করে? সুতরাং যখন যেভাবে খুশী তসলিমা পবিত্র কুরআন, ইসলাম ও হাদিসগ্রন্থসমূহের ওপর আক্রমণাত্মক রচনা ছাড়াও যত্রতত্র সাক্ষাৎকার দিয়ে চলেছে। তার বক্তব্যের মারাত্মক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টির সামান্য আভাস পেয়েই আবার সাক্ষাৎকার প্রকাশকারী ভারতীয় পত্রিকায় চিঠি লিখে সে প্রতিবাদ জানিয়ে বলেছে, আমি তো ওসব কথা বলিনি। আমি কুরআনকে বদলে ফেলতে বলিনি, সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী আমার সম্বন্ধে এসব বানিয়ে বলেছে ইত্যাদি। পরক্ষণেই হয়তো দেখা গেল তসলিমা জার্মানীর একটি পত্রিকায় বা টিভিতে ইন্টারভিউ দিতে গিয়ে বলছে, ইসলাম আমি মানি না। কুরআনে ভুল আছে। ইসলামে নারীদের কোনো স্বাধীনতা নেই।

এহেন তসলিমাকে নিয়ে বাংলাদেশের মানুষের প্রারম্ভে কোনো মাথা ব্যথাই ছিল না। এ ধরনের আরও কিছু লেখক ও বুদ্ধিজীবী বাংলাদেশে আগে থেকেই ছিল : তারা কলকাতার আনন্দবাজার পত্রিকা গোষ্ঠীর পা চেটেই মহানন্দে জীবনধারণ করে যাচ্ছিল। তাদের সাহিত্যকর্ম ও কবিকীর্তি নিয়ে প্রকৃতপক্ষে এ দেশের জনগণ ও দেশপ্রেমিক লেখক-বুদ্ধিজীবীরা তেমন গা করেন না। সকলেই জানেন এরা কলকাতা ঘেঁষা। এরা দেশের সীমানা পর্যন্ত তুলে দিয়ে ভারতের সাথে মার্জ করে যেতে চায়। এরা আনন্দবাজারীদের ঝুলিয়ে রাখা মূলো আনন্দ পুরস্কারকেই জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ অর্জন বলে মনে করে। আনন্দ পুরস্কারের তালিকায় যখনই কোনো মুসলমান নামধারী লেখক বা

www.pathagar.com

লেখিকার নাম ওঠে তখন এ দেশের সচেতন শিক্ষিত মুসলিম মাত্রই ধরে নেয় যে, এই ব্যক্তি বা মহিলাটি তার স্বজাতি, স্বদেশ ও স্বধর্মের বিরুদ্ধে কিছু লিখেছে। স্বজাতি, স্বদেশ ও স্বধর্মের বিরুদ্ধে যার কোনো সাহিত্যিক অবদান নেই তেমন কোনো বাংলাদেশী মুসলমান নামধারী লেখকের পক্ষে ঐ আনন্দবাজারীদের ঝুলিয়ে রাখা মূলোটি সহজে কপালে জোটে না। তসলিমা না রিনসহ এই শ্রেণীর লেখকদের এ দেশের সকলেই জানে। তাদের কাজের ধরন ও দেশেপ্রেমের পরাকাষ্ঠার কথা এ দেশের দেশপ্রেমিকদের অজানা নয়। আনন্দবাজারগোষ্ঠী এদেরকেই তাদের পুরস্কারের জন্য বাছাই করেছেন। তবে ঐ বাছাইয়ের ফলাফলটা স্বভাবতই তসলিমার ভাগ্যেই সবার আগে। আর মান থাকে না বলে শুনেছি অনেক ধরাধরি এবং অশ্রুসজল যোগাযোগের পর অন্য এক আনন্দবাজারী কবিকে এ তালিকায় ফেলা হয়। দু'জনেই একই পথের পথিক, আদর্শ ও বক্তব্যও এক, তবুও লেডিজ ফার্স্ট বলে কথা। তসলিমার আনন্দ পুরস্কার প্রাপ্তির যৌক্তিকতা প্রতিপন্ন করারও একটি যুক্তি থাকতে হবে। নইলে কলকাতার দুর্মুখ বুদ্ধিজীবী, সাংবাদিক এবং আনন্দগামী কবি-লেখক গোষ্ঠীর গোমড়া মুখ কতক্ষণ হজম করা যায়? তাছাড়া ঢাকার আনন্দগামীদেরও মুখ রক্ষা না করলে চলে না। সুতরাং মূলোটি ঐ ঢাকাইয়া মুখের কাছেই নামিয়ে দাও। কিন্তু একথা ভেবো না ওটা তসলিমার চেয়েও পয়মন্ত। কক্ষনো ভেবো না আমাদের শক্তি-সুনীলের হাঁটু বা পায়ের কাছাকাছি ঐ সাদামুখোকে আমরা বিবেচনা করি? আনন্দ মূলোতো কেবল সাহিত্যের জন্যই আমরা দিই না। ঐ মূল্যের কত যে অর্থ আছে। কত বিচিত্র কৃতিত্বের জন্যই না ওই মূলে আমরা ঝুলন্ত অবস্থা থেকে কারো কারো মুখের কাছে নামিয়ে আনি। এই হলো আনন্দবাজারীদের মূলোতত্ত্ব।

'আনন্দবাজার,' 'আজকাল' ও 'বর্তমান' কলকাতার এই তিন কাগজ তসলিমা প্রসঙ্গটি সেখানকার বুদ্ধিজীবীদের গেলাবার বহু চেষ্টা করেও সম্প্রতি বিফল হয়েছে। সকলেই আন্দাজ করে ফেলেছে তসলিমার আসল পুঁজি হল প্রচার। ইসলামের বিরুদ্ধে বা পবিত্র কুরআনের বিরুদ্ধে একবার কথা তুলতে পারলে তাকে আর পায় কে? সালমান রুশদীকে কলকাতার উপরোক্ত কাগজগুলো যেভাবে সমর্থন জানায় তা দেখে তসলিমা প্রথম ভেবেছিল রুশদীর মত আত্মগোপন করে থাকার তার দরকার হবে না। কারণ কলকাতার আনন্দবাজারীরা তার পক্ষে আছে। যাই ঘটুক আনন্দবাজার গোষ্ঠীর শেলটার সে পাবে। তার ইসলাম বিরোধী প্রবন্ধাদি এবং লজ্জা উপন্যাসের সাম্প্রদায়িক সাফল্যে সে আরও দুঃসাহসী হয়ে ওঠে। 'লজ্জা' বিজেপির সাম্প্রদায়িক হাতিয়ারে পরিণত হয়। ঐ পুস্তকে কথিত বাংলাদেশে হিন্দু নির্যাতনের কল্পিত কাহিনীকেই বিজেপি এবং হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা ভারতের সর্বত্র প্রচার করে মুসলিম হত্যায় ইন্ধন যোগায়। বিজেপি লজ্জা বইটিকে ব্যাপকভাবে প্রচার করে এবং এই সুবাদে তসলিমাকে দেয়া হয় বিপুল অর্থ। শোনা যায় ঐ টাকায়ই নাকি তার আনন্দবাজারী তত্ত্বাবধায়করা তাকে

www.pathagar.com

কলকাতায় সল্ট লেকে ফ্লাট কিনে দেয়। তসলিমাকে আশ্বস্ত করা হয় বাংলাদেশে সে তার কাজ চালিয়ে যাক। তসলিমা সেখানে একদিন যখন টিকতে পারবে না তখন তার জন্য তো আশ্রয়ের ব্যবস্থা রইলই।

এ আশ্বাসের ফলেই তসলিমা স্থানীয় ধর্মবিরোধী, মুরতাদ এবং তালিকাভুক্ত ভারতীয় দালালদের সকলের মাথাই ছাড়িয়ে যায়। সে এখন দেশের সীমানা তুলে দিয়ে ভারতের সাথে মার্জ হয়ে যাওয়ার প্রকাশ্য বক্তব্যও সাক্ষাতকারে প্রচার করতে থাকে। এর ফলে মুক্তিযোদ্ধা ও দেশপ্রেমিক বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে গুঞ্জন শুরু হয়। পত্রপত্রিকায় এর প্রতিবাদ শুরু হয়। কিন্তু চিহ্নিত কতিপয় লোক এ ব্যাপারে আশ্চর্যজনকভাবে নিশ্চুপ থাকে। এর মধ্যেই তসলিমা কলকাতার স্টেটসম্যান পত্রিকায় পবিত্র কুরআনের বিরুদ্ধে সোজাসুজি অত্যন্ত অসম্মানজক মন্তব্য দিয়ে আসে। কিন্তু স্টেটসম্যানে তার পবিত্র কুরআন বদলে ফেলার বেসামাল উক্তিটি উপমহাদেশ তথা বাংলাদেশের সাধারণ ধর্মপ্রাণ মুসলমান নর-নারীরা সহজভাবে নেবে না এটা আন্দাজ করতে পেরেই সে বক্তব্যকে অস্বীকার করে ঢাকায় এবং কলকাতায় প্রতিবাদ লিপি পাঠিয়ে জনগণের ক্রোধ এবং অস্বস্তিকে প্রশমনের ব্যর্থ চেষ্টা করে। কিন্তু ততক্ষণে ঢাকার নিষ্ক্রিয় দক্ষিণপন্থী বুদ্ধিজীবীদের মৃদু প্রতিবাদ এবং সমালোচনার সীমা ছাড়িয়ে পবিত্র কুরআন অবমাননার বিষয়টি গ্রামে-গ্রামে প্রতিটি মসজিদ, অন্যান্য ধর্মীয় কেন্দ্র, পীর মাশায়েখদের খানকা, স্কুল কলেজে ছড়িয়ে পড়ে। ইসলামী রাজনৈতিক দলগুলো এবার দৃঢ়ভাবে তসলিমার নষ্টামির প্রতিবাদ জানায় আর আলেম সমাজ এগিয়ে এসে পবিত্র কুরআনের অবমাননার প্রতিবাদে হরতালের ডাক দেয়। এদিকে সরকার বাধ্য হয় মুখ রক্ষার জন্যে তসলিমার বিরুদ্ধে মামলা করতে কিন্তু আবার তাকে আত্মগোপনেরও সুযোগ দেয়া হয়।

এখন তসলিমাকে নিয়ে পাশ্চাত্য মিডিয়াগুলো সরকার বিরোধী বক্তব্য দিতে শুরু করে। তসলিমা ঢাকাতেই কোনো পাশ্চাত্য কূটনীতিকের শেলটারে আছে এ ধরনের কথাবার্তা ছড়িয়ে পড়া সত্ত্বেও সরকার কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণে ব্যর্থ হয়। সকলেই বুঝতে পারে তসলিমাকে গ্রেফতারের সামান্যতম ইচ্ছাও সরকারের নেই। তসলিমা মনের আনন্দে ঢাকায় বসেই বিবিসি, অস্ট্রেলিয়ান ও জার্মান পত্র-পত্রিকা এবং অন্যান্য মিডিয়াকে সাক্ষাৎকার দিয়ে বুঝিয়ে দেয় যে তাকে গ্রেফতার করার ক্ষমতা সরকারের নেই। সে বাংলাদেশের সকল আইন-কানুনের উর্ধ্বে। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ক্লিনটও যেখানে তার ব্যাপারে উদ্বেগ প্রকাশ করেন, সেখানে বাংলাদেশের আইন তার গায়ে হাত দিতে পারবে না।

তসলিমা এখনও দেশেই আছে। কোথায় কিভাবে আছে আমাদের ধারণা তা সরকারের চেয়ে বেশী কেউ জানে না। কিন্তু সরকার তাকে গ্রেফতার করার সাহস রাখে না। কারণ তসলিমার পেছনে আছে পাশ্চাত্য এবং ভারতীয় সংবাদপত্রগুলোর ব্যাপক

www.pathagar.com

সমর্থন।

আমাদের প্রশ্ন হলো, তসলিমাকে গ্রেফতার করার নৈতিক শক্তি যেখানে সরকারের নেই সেখানে তার বিরুদ্ধে মামলার প্রহসনটা কেন? এটা কি তসলিমার মত দেশ ও ধর্মদ্রোহিনী নারীকে জনণের আক্রোশ থেকে বিশেষ ধরনের নিরাপত্তা দানেরই একটা কৌশল নয়?

আমরা শুনেছি তসলিমাকে রাজনৈতিক আশ্রয় দিতে পাশ্চাত্যের কোনো কোনো দেশ নাকি আগ্রহী। কোথাকার কোন্ কূটনৈতিক নাকি এ বিষয়ে পরাশর্ম করতে দিল্লী থেকে ঢাকায় এসেও ঘুরে গেছেন। আমাদের মনে হয় তসলিমার বিরুদ্ধে ঐ গ্রেফতারী পরোয়ানাটির আইনগত বাধ্যবাধকতা না থাকলে তসলিমা ঐ সুযোগে তার পাশ্চাত্য পৃষ্ঠপোষকদের রাজনৈতিক আশ্রয়ে নিরাপদে চলে যেতে পারত। আমাদের মনে হয় গ্রেফতারী পরোয়ানাটিই সরকারকে নানা বাধ্যবাধকতায় গ্রেফতার করে রেখেছে।

দেশের সার্বভৌমত্ব, আইন-কানুন ও আন্তর্জাতিক কূটনৈতিক শিষ্টাচার সবকিছুই এ সরকার দেশের মাটিতে অচল এবং সর্বক্ষেত্রে স্থবির করে রাখতে বাধ্য হচ্ছেন। আমরা জানি না, একটা নির্বাচিত সরকারের কার কাছে এই বাধ্যবাধকতা? ইসলাম হলো দেশের এগারো কোটি নরনারীর স্বতস্ফূর্ত বিশ্বাসের ভিত্তিভূমি। ঈমানের অবমাননার জন্য যারা দায়ী তাদের আজ না হোক কাল শাস্তি পেতে হবে। সব অপরাধের শাস্তিই যে সব সরকার দিতে পারেন এমন নয়, তবে অপরাধী শেষ পর্যন্ত কোনো না কোনো অছিলায় শাস্তি পেয়ে যায়। তসলিমাও পাবে। মামলার প্রহসনটা না করলেও চলত। কারণ বর্তমান সরকার পাশ্চাত্য কূটনৈতিকদের দেশের অভ্যন্তরে কূটনৈতিক আচরণবিধি লংঘনের যে সুযোগ দিলেন তা ভবিষ্যতের জন্য একটি অতিশয় মন্দ দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে। একজন দুষ্কৃতকারিণীর জন্য একটা দেশের সার্বভৌম গণতান্ত্রিক সরকারের এমন নতজানুনীতির কোনো দৃষ্টান্তই খুঁজে পাওয়া যাবে না। জেনেভা কনভেনশন অনুযায়ী কূটনৈতিকদের আচরণ কেমন হবে তা সমঝে দেয়ার মত সরকার এখন হয়ত বাংলাদেশের শাসন ক্ষমতায় নেই। কিন্তু কোনো দিন যে আসবে না এমন ধারণা ঢাকার কূটনৈতিক পাড়ার থাকা সঙ্গত নয়। কোনো কোনো মহামান্য রাষ্ট্রদূত তসলিমার মত একটি বিকৃতরুচির তৃতীয় শ্রেণীর লেখিকার ধর্মদ্রোহিতার প্রশ্রয় দাতা সেজে ভালো কাজ করেননি। কারণ এগারো কোটি মুসলিম নর-নারীর ঘৃণা অর্জন করতে কোনো দেশই তাদের কূটনৈতিক প্রতিনিধিকে ঢাকায় পাঠায়নি। প্রত্যেক রাষ্ট্র তাদের জাতীয় স্বার্থ, ব্যবসা-বাণিজ্য ও সাংস্কৃতিক বিনিময়ের জন্য এখানে কষ্ট করে আছেন। তাদের স্বার্থেই তারা আছেন, বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে নয়। কিন্তু বর্তমান সরকারের দুর্বল পররাষ্ট্রনীতি, কূটনৈতিক অক্ষমতা এবং আধিপত্যবাদী প্রতিবেশীদের মনোরঞ্জনের ব্যর্থ চেষ্টা দেখে সকলেই সর্বক্ষেত্রে নাক গলাতে সাহসী হয়ে উঠেছে। বাংলাদেশের বর্তমান ক্ষমতাসীনরা কূটনৈতিক ক্ষেত্রে

www.pathagar.com

দেশের এগারো কোটি মুসলিম বাসিন্দার ক্ষমতা, ইচ্ছা-অনিচ্ছা, ঈমান এবং প্রতিরোধ ক্ষমতার কোনো ইঙ্গিত স্থানীয় কূটনৈতিক পাড়ায় যথাযথভাবে প্রতিফলিত করতে ব্যর্থ হওয়াব ফলেই আজ তাদের কেউ কেউ দূতাবাসেই তসলিমার মত অপরাধিনীকে নিশ্চিন্তে আশ্রয় দিতে পারে। সরকার যদি তার ভোটারদের শক্তি ও মনোবাঞ্ছা এতটুকু আন্দাজ করতে পারতেন তবে কূটনৈতিক শিষ্টাচার লংঘন করে একটি রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে অযাচিত হস্তক্ষেপের জন্য কূটনৈতিক ব্যক্তি বিশেষকে অবাঞ্ছিত ঘোষণা করার সাহস দেখাতেন। এটা কি করে সম্ভব যে তসলিমাকে আইনের পরোয়ানা থেকে বাঁচাতে ঢাকায় অবস্থিত কোনো বিদেশী কূটনৈতিক এগিয়ে আসার সাহস দেখাবে? তবে কি এ মিশনগুলো এখানে তাদের স্বাভাবিক তৎপরতার বাইরে পা ফেলারও ছাড়পত্র আদায় করে নিয়েছে?

আমরা জনগণের ক্ষুব্ধ প্রতিবাদ এবং পবিত্র কুরআনের পক্ষে দেশের আলেম সমাজের ব্যথাতুর প্রতিক্রিয়ার দোহাই দিয়ে সরকারকে উদাসীনতা পরিত্যাগে উদ্বুদ্ধ করতে তাই। পরিস্থিতি যে ধরনের আন্তর্জাতিক চাপই সৃষ্টি করুক, সরকারের উচিত অবিলম্বে তসলিমাকে গ্রেফতার করে কোর্টে হাজির করা এবং দেশের আইন অনুযায়ী তার বিচার করা। এগারো কোটি মানুষের বিশ্বাসজনিত বেদনার চেয়ে কোনো তসলিমা নাসরিনই বেশী বড় নয়। যে দেশ তার অভ্যন্তরীণ প্রচলিত আইনও অপরাধীর বিরুদ্ধে প্রয়োগ করতে গিয়ে কূটনৈতিক চাপের কাছে থমকে দাঁড়ায় সে দেশকে কেউ স্বাধীন বলেই গ্রাহ্য করে না। দেশবাসী এই অপমানজনক পরিস্থিতি আর সহ্য করতে পারছে না।

১৯/৭/৯৪

www.pathagar.com

ওড়নার ওপর নিষেধাজ্ঞা ঃ ভয় না প্রতিশোধ?

ফরাসীরা একটা সুসভ্য জাতি হিসেবে বিশ্বের কাছে পরিচিত। শিল্প-সাহিত্য-দর্শন-বিজ্ঞানে এ জাতির অনুরাগের কথা আমরা কে না জানি। কেবল যুদ্ধবিগ্রহের বীরত্ব বা পরের দেশে উপনিবেশ স্থাপনের কাহিনী দিয়ে একটা জাতির সম্যক পরিচয় ঘটে না। আরও কিছু ঘটনা থাকে যা না জানলে একটা জাতির সামগ্রিক পরিচয় জানা হয় না। সেটা হল বিশ্বদৃষ্টি। একটা জাতি তার প্রতিবেশী মানব সমাজকে কিভাবে দেখে। এ ব্যাপারেও একদা ফরাসীদের দৃষ্টিভঙ্গীর উদারতা ও গণতন্ত্রের জন্য তাদের ব্যাকুলতার কথা কমবেশী আমাদের জানা আছে। ফরাসীরা ধর্মের ব্যাপারেও উদার বলেই আমরা জানতাম। অন্যান্য ইউরোপীয় জাতি থেকে ঐ ধরনের সহনশীল দৃষ্টিভঙ্গীই ফ্রান্সকে একটু বিশিষ্ট বা আলাদা করে রেখেছিল।

কিন্তু আফ্রিকার আরব উপনিবেশগুলো ফ্রান্সের হাতছাড়া হয়ে যাওয়ার পর থেকেই ফরাসী উদারতা ও গণতান্ত্রিক ন্যায় বিচারের দৃষ্টিভঙ্গীটি ফরাসী সরকারগুলোর হাতছাড়া হয়ে যেতে শুরু করেছে। বর্তমানে ফরাসী সরকারের ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গী অত্যন্ত অনুদার এবং বিশেষ ধর্মের প্রতি একটু বিদ্বেষমূলক বলেই ধারণা হবে। অথচ ফ্রান্সে খৃস্টান সম্প্রদায়ের পর মুসলিমরাই সেখানকার দ্বিতীয় ধর্মীয় সংখ্যালঘু। যে সংখ্যালঘুদের দায়ভার ফরাসী জাতির পক্ষে এখন আর অস্বীকার করার উপায় নেই। সমকালীন ফ্রান্স এখন বেশ এক বড়সংখ্যক মুসলিম অভিবাসীর জন্মভূমি। প্যারিস বা ফ্রান্সের অন্যান্য এলাকায় কয়েক পুরুষ ধরে বসবাস করছে এমন মুসলিম পরিবারের সংখ্যাও একেবারে কম নয়। তাছাড়া ভাগ্যান্বেষণে কিংবা শ্রমিক হিসেবেও আফ্রিকার ফরাসী উপনিবেশগুলো থেকে দলে দলে আরব পরিবারগুলো গিয়ে সেখানে বসবাস করে সেখানে এক সমৃদ্ধ স্বতন্ত্র সংস্কৃতি গড়ে তুলেছে। ফরাসী ভাষাকে তাদেরই ছেলেমেয়েরা মাতৃভাষারূপে শুধু গ্রহণই করেনি ঐ ভাষার সাহিত্য উদ্যমেও এখন তাদের অবদানের ছিটেফোটা জমা হতে শুরু করেছে। তাছাড়া সেখানকার স্বনামধন্য ফরাসী কবি সাহিত্যিকদের সমকালীন রচনায়, তাদের এখনকার চিত্রকলায় এবং সংগীতে আরবদের প্রত্যক্ষ প্রভাব বেশ লক্ষ্যযোগ্য হয়ে উঠেছে। ফ্রান্স এখন এককভাবে কেবল গল বা ফরাসী জাতিরই দেশ নয়। পরিত্যক্ত আফ্রিকার ফরাসী উপনিবেশ থেকে আগত অভিবাসী সাদা কালো আরব-আফ্রিকান মুলমানদেরও দেশ। এমন একটি দেশে গণতান্ত্রিক ন্যায়বিচার এবং ধর্মীয় সহনশীলতাই সকলের কাম্য।

সম্প্রতি ফরাসী সরকার এই ন্যায়নীতি পরিত্যাগ করে ফ্রান্সে কিছু অন্যায়

www.pathagar.com

নিষেধাজ্ঞা জারি করে সংকীর্ণতার পরিচয় দিয়েছেন। সবগুলো নিষেধাজ্ঞাই বলাবাহুল্য ইসলামী জীবনধারা ও মুসলমানদের ধর্মীয় আচার-আচরণ এবং পবিত্র কুরআনের পালনীয় আদেশের বিরুদ্ধে। বেশকিছুকাল যাবত ফ্রান্সের কিছু অসহিষ্ণু খৃস্টান পাদরী এবং ইহুদী সম্প্রদায় সেখানকার মুসলিম জনগণের ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের বিরোধিতা ও প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির চেষ্টা করে আসলেও ফরাসী সরকার এবং ফরাসী জনগণের এতে কোনো সায় না থাকায় সেখানকার সাম্প্রদায়িক শক্তি মাথাচাড়া দিতে পারেনি। বিচ্ছিন্নভাবে কোনো একটি স্কুলে বা আরও উচ্চ কোনো বিদ্যালয়ের কোনো অধ্যক্ষ বা শিক্ষক মুসলিম বালিকাদের মাথায় স্কার্ফ বা ওড়না দেখে তা খুলে ফেলার নির্দেশ দেয়। মুসলিম বালিকারা শিক্ষকের এই সাম্প্রদায়িক ইতর নির্দেশ স্বভাবতই অস্বীকার করে। পরিণামে তাদের সেখানকার কয়েকটি বিশেষ ধরনের সাম্প্রদায়িক স্কুল-কলেজ থেকে বের করে দেয়া হয। এতে সারা ফরাসী নাগরিকদের মধ্যে বাদানুবাদ শুরু হলেও মুসলিমদের ঐক্যবদ্ধ প্রতিবাদের মুখে পরিস্থিতি সাধারণ নাগরিকদের বিবেককে নাড়া দেয়। তাদের কেউ কেউ বলেন যে, বিষয়টা একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের ধর্মীয় নীতিবোধের সাথে জড়িত। মুসলিম বালিকাদের মাথার কাপড় খুলে ফেলতে বলা যদি অনুচিত না হয়, তবেতা ক্যাথলিক নানদের ধরাচূড়া ফেলে জীন্‌স্ পরতে বাধ্য করাও অনুচিত হবে না। এসব বাদ-প্রতিবাদেও ফ্রান্সের একশ্রেণীর সাম্প্রদায়িক স্কুল কর্তৃপক্ষ মুসলিম ছাত্রীদের প্রতি তাদের একপেশে দৃষ্টিভঙ্গী পরিত্যাগ করেনি। তবে সব স্কুল কর্তৃপক্ষই যে এরূপ সাম্প্রদায়িক আচরণে অভ্যস্ত এমন নয়। তাছাড়া সেখানকার সংখ্যালঘু মুসলমানরা এ নিয়ে অনমনীয় আন্দোলন অব্যাহত রাখায় সবাই আশা করেছিল যে ফরাসী সরকার মুসলমানদের ধর্মীয় স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করতে কাউকে দেবে না।

কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়, বর্তমান ফরাসী সরকার সম্প্রতি ফ্রান্সের মুসলিম মেয়েদের ওড়না ব্যবহারের বিরুদ্ধে এক সাম্প্রদায়িক নিষেধাজ্ঞা জারি করেছেন। এই আদেশ বিশ্বের একশ বিশ কোটি মুসলিমের ধর্মীয় বিশ্বাসের ওপর কদর্য হস্তক্ষেপ ছাড়া আর কিছু নয়। এই আদেশের দ্বারা গোটা ফরাসী জাতির সহনশীলতা ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধকেই অস্বীকার করা হল। এতে ফ্রান্সের মুসলিম সংখ্যালঘুদের ওপর এককভাবে এমন একটি নিষেধাজ্ঞা চাপিয়ে দেয়া হল যা কোনো মুসলিম দেশ অতীতে বা বর্তমানকালে তাদের খৃস্টান সংখ্যালঘুদের ওপর আরোপ করেনি। এই নিষেধাজ্ঞা শেষ পর্যন্ত ফ্রান্সের দ্বিতীয় বৃহত্তর সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মনে দারুণ বিদ্বেষজ্বালার জন্ম দেবে মাত্র। তাছাড়া এটা ফরাসী গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের অধপতনের কারণ হবে বলে আমরা ধারণা করি।

পৃথিবীর সর্বত্রই মুসলমানরা এই জঘন্য সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গীর সমালোচনা করছে। বাংলাদেশের এই অন্যায় আদেশ তুলে নিয়ে সেখানকার মুসলিম সংখ্যালঘুদের

www.pathagar.com

ধর্মীয় বিধি পালনে স্বাধীনতা দিতে বর্তমান ফরাসী প্রেসিডেন্ট ফ্রাঁসোয়া মিতেরাঁকে একটি তার বার্তা প্রেরণ করেছেন। সম্ভবত সারা বিশ্বের মুসলিম নের্তৃবৃন্দও এই বিষয়টির প্রতি বর্তমান ফরাসী সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। বিশ্ব মুসলিমের এই প্রতিবাদ ফরাসী সরকার কিভাবে বিবেচনা করবেন তা আমাদের জানা না থাকলেও, এই নিষেধাজ্ঞা জিদের বশে কার্যকর করতে গেলে মুসিলম বিশ্বে এর বিরূপ প্রতিক্রিয়া শেষ পর্যন্ত ফ্রান্সের জনগণের জন্য হতাশাব্যঞ্জকই হবে। এতে খৃস্টান-মুসলমানদের সংঘাত বাড়বে। অথচ মুসলমানরা মনে করে খৃস্টান ও মুসলমানদের পারস্পরিক ধর্মীয় সহযোগিতার মধ্যেই বিশ্বশান্তি এবং অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি নিরাপত্তা পেতে পারে। পাশ্চাত্যের কোনো কোনো দেশে নির্বিচারে মুসলিম নিধন ও তাদের ধর্মীয় স্বাধীনতার ওপর গণতান্ত্রীক ও প্রগতির নামে যথেচ্ছ হস্তক্ষেপ শেষ পর্যন্ত ইউরোপীয় স্বার্থের জন্যই বিপর্যয়কর হবে। তাছাড়া ধর্মীয় বিদ্বেষ জিইয়ে রাখাও এক ধরনের কুসংস্কার।

নারী স্বাধীনতা নিয়ে পাশ্চাত্যের দুর্ভাবনা মুসলিম মেয়েদের ওপর চাপিয়ে দেয়ার চেস্টা ব্যর্থ হতে বাধ্য। কারণ পবিত্র কুরআন মুসলিম মেয়েদের পর্দার বিধান দিয়েছে। ইসলাম পরিত্যাগ না করে কোনো মুসলিম নারীর এই বিধানের যৌক্তিকতা অস্বীকার করার উপায় নেই। হতে পারে কোনো কোনো পাশ্চাত্য শিক্ষিত মুসলিম মহিলা পর্দা না করে চলছেন কিন্তু সেটা যে পবিত্র কিতাবের আদেশমালার বরখেলাপ একথা তিনিও জানেন। পাশ্চাত্যের নারীমুক্তিবাদীদের একটা বিষয় মেনে নিতে হবে যে মুসলিম সমাজের মেয়েরা এরকমই হয়। প্রত্যেক জাতির কিছু সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য আছে যা ধর্মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। মুসলিম মেয়েরা, তারা পাশ্চাত্যেই অবস্থান করুক কিংবা প্রাচ্যে পবিত্র কুরআনের নির্দেশের বাইরে যেতে পারে না। স্কুলে মুসলিম মেয়েরা স্কার্ফ পরিধান করবেই। তারা তো আর খৃস্টান বা ইহুদী শিক্ষার্থী মেয়েদের মাথায় ওড়না জড়িয়ে ক্লাসে আসতে প্ররোচিত করছে না। তাহলে কেন মুসলিম ছাত্রীদের ওপর ফরাসী সরকার এই অন্যায় আদেশ জারি করল? নাকি এর একটা প্রভাব আছে, যার শুভফল পাশের মেয়েটিকেও নির্লজ্জ বা বেহায়া না হতে প্ররোচিত করে?

আমরা ফরাসী সরকারকে সেখানকার ধর্মীয় সংখ্যালঘু মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রতি আরও উদার দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণের অনুরোধ করি। আলজেরিয়ায় ইসলামী আন্দোলনের বিরুদ্ধে সামরিক জান্তাকে সমর্থন দানে স্বভাবতই সারা উত্তর আফ্রিকার মুসলিম অধিবাসী এবং ইসলামী আন্দোলনের সাথে ফ্রান্সের বিদ্বেষ সৃষ্টি হয়েছে। এতে ফরাসী স্বার্থ মার খাবেই। কারণ ফ্রান্স স্বৈরাচার ও জুলুমবাজদের দোসর ও গণতন্ত্রের শত্রু হিসেবে সেখান ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। এই জিদ মেটাতে নিজের দেশের মুসলমানদের ওপর খাপ্পা হয়ে ওঠা অনুচিত। তাতে বর্তমান ফরাসী সরকার কেবল ভারসাম্যহীন ও দিশেহারা আচরণেরই শিকার হবে মাত্র। ফ্রান্সের মুসলিম সম্প্রদায় কোনো অবস্থাতেই পাশ্চাত্য জীবন প্রণালীতে আকৃষ্ট হবে না। অথচ ফ্রান্সেই তারা বসবাস করবে মুসলমান হিসেবে। এ সত্য মেনে নেয়াই সবদিক দিয়ে উত্তম।

২০/৯/৯৪

www.pathagar.com

তসলিমাকে নিয়ে পৃষ্ঠপোষকদের সমস্যা

সম্ভবত তসলিমা নাসরিনকে নিয়ে পাশ্চাত্যের লেখকগোষ্ঠীর নতুন এক সমস্যার উদ্ভব হতে যাচ্ছে। আমরা অবশ্য আগেই বলেছিলাম তসলিমাকে নিয়ে সুইডেনের মত ইসলাম বিদ্বেষী অতি উৎসাহী দেশের কূটনীতিকগণ এবং অন্যান্য ইউরোপীয় দেশের গুজবপ্রিয় লেখক-শিল্পীরা বেশীদূর এগোতে পারবেন না। তসলিমা তেমন পর্যায়ে সাহিত্য প্রতিভা নয়। কেবল ভারতীয় পত্র-পত্রিকার ব্যাপক প্রচার, কলকাতার সাম্প্রদায়িক পত্রিকা ও প্রকাশনাগোষ্ঠী আনন্দবাজারের পৃষ্ঠপোষকতা এবং ভারতীয় জনতা দলের মুসলিম নিধনযজ্ঞের উদ্দেশ্যে লক্ষ লক্ষ ডলার ব্যয়ে 'লজ্জা' বইয়ের বেপরোয়া প্রচার স্বত্ব কেনা ইত্যাদিই তসলিমাকে লেখক করে তোলে। বাংলা ভাষার পাঠকদের কাছে তসলিমা একজন প্রচারপ্রিয় সাবস্ট্যান্ডার্ড লেখক ছাড়া কিছু নয়। তবুও ভারতীয় প্রচারের গুণে তসলিমা সীমা ছাড়িয়ে তার নিজের আকারের চেয়ে অনেক বড় হয়ে প্রতিভাত হয়। আর ঢাকার বৈদেশিক দূতাবাসগুলোর অপরিপক্ক কূটনৈতিক তৎপরতার ফলে তসলিমা যা নয় সে রকমই ফেপে ওঠে। ঢাকার ঐসব কর্মতৎপর কূটনীতিকরা ভেবেছিলেন তারা এতকাল পরে আরেকজন সালমান রুশদী আবিষ্কার করে ফেলেছেন। তাদের সহায়তায়ই তসলিমা একটি দরিদ্র মুসলিম দেশের আইনকানুন ও ধর্মীয় মূল্যবোধকে অবজ্ঞা করার সাহস দেখায়। এমন কি ঐসব কূটনীতিকদের কারসাজিতেই সরকার তসলিমাকে সসম্মানে দেশ ছেড়ে যাওয়ার সুযোগ করে দিতে বাধ্য হয়। যদিও এতে আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে যে, তসলিমার ব্যাপারে ঢাকার বিদেশী কূটনীতিকদেরই জয় হয়েছে, কিন্তু আমরা মনে করি কূটনৈতিক শিষ্টাচারের দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে বিচার করলে বলতেই হবে যে এতে ঢাকার বিদেশী দূতদের তেমন কোনো লাভ হয়নি। বাংলাদেশের মত একটি দরিদ্র ভীতত্রস্ত দেশের সরকারকে ঘাবড়ে দেয়া সম্ভব হলেও তসলিমার ব্যাপারে এ দেশের এগারো কোটি মুসলিম নর-নারীর হৃদয়ে যে ঘৃণার আগুন জ্বালানো হয়েছে তা সমভাবে ঢাকায় অবস্থিত ইউরোপীয় তথা স্ক্যান্ডিনেভিয়ান দেশগুলোর সরকারের প্রতি ভেতরে ভেতরে জ্বলছে। তসলিমার আশ্রয়দাত্রী সুইডেনকে কখনো এ দেশের মানুষ আর ভালো চোখে দেখবে না। এ দেশের প্রতিটি মানুষ জানে সুইডেনের বর্তমান সরকার ও এর ঢাকাস্থ কূটনৈতিক প্রতিনিধিরা কেবল ইসলাম বিদ্বেষে প্রণোদিত হয়েই তসলিমাকে এখান থেকে নিয়ে যাওয়ার পাঁয়তারা করেছে। তাদের আচরণ একটি সার্বভৌম জাতির প্রতি অযথা শত্রুতা সাধন ছাড়া আর কিছুই নয়।

www.pathagar.com

আমরা আগেই বলেছিলাম তসলিমাকে নিয়ে ইউরোপীয় ইউনিয়ন তথা আশ্রয়দানকারী সুইডেন এবং স্থানীয় 'পেন' ক্লান্ত হয়ে পড়বে। আমরা যে ভুল বলিনি ইতোমধ্যেই সেসব আলামত প্রকটিত হতে শুরু করেছে। সালমান রুশদীকে নিয়ে এখন যেমন পাশ্চাত্যের ইসলাম বিদ্বেষী সরকার, কূটনীতিক এবং প্রকাশকগোষ্ঠীর আর কিছুই করার নেই, তেমনি তসলিমা নাসরিনকে নিয়েও অচিরেই তাদের আর কিছু করার থাকবে না। আমাদের ধারণা তসলিমা আগামী কিছুকালের মধ্যেই ঢাকায় ফেরার জন্যে নতুন বায়না ধরবে। সেতো আগেই বলে রেখেছে, আমি সুইডেনে রাজনৈতিক আশ্রয় চাইব না। আমি সময় ও সুযোগমত দেশে ফিরে যাব। আমাদের মনে হচ্ছে সে সময় ও সুযোগ সন্ধানে আর বেশী বিলম্ব হবে না। দেখা যাবে যে, যেমন তড়িঘড়ি কূটনৈতিক ভেল্কি দেখিয়ে সুইডেন তসলিমাকে বাংলাদেশের বাইরে পাচার করেছিল তেমনি নতুন কোনো ছলচাতুরীর মাধ্যমে তাকে পুনর্মূষিক বানিয়ে বাংলাদেশে পাঠাবার তোড়জোড় শুরু করেছে। যদিও বাংলাদেশ এ আপদ দূর হয়ে যাওয়ায় স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বেঁচেছে।

সালমান রুশদী শয়তানের পদাবলী লিখে যে কাজটি করতে চেয়েছিল তা নানাভাবেই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। কারণ এ বইয়ের বিশ্বব্যাপী বিরোধিতা দেখে খৃস্টান ও ইহুদীরাও বইটির আসল উদ্দেশ্যের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেনি। আর ধর্মনিরপেক্ষ ও নাস্তিকরা এর থেকে কোনো রসই গ্রহণ করতে পারেনি। কারণ এর মধ্যেই হযরত মোহাম্মদ (সঃ) ও ইসলাম সম্বন্ধে পাশ্চাত্যের জ্ঞান সামান্য হলেও, অপেক্ষাকৃত স্পষ্ট হতে শুরু করেছে। তাছাড়া পাশ্চাত্যের নারী সমাজে ইতিমধ্যেই ইসলামের প্রতি আকর্ষণ বেড়েছে। আমেরিকায় এবং বৃটেনে কনভারসন রেটও উল্লেখ করার মত পর্যায়ে উপনীত হয়েছে। তেমন কোনো প্রচার ছাড়াই অনেক ইংরেজ মহিলাই এখন খৃস্টধর্ম পরিত্যাগ করে ইসলাম গ্রহণ করেছে। সামাজিক পীড়নের ভয় ও পথেঘাটে বৃটিশ গুন্ডাদের দাপট উপেক্ষা করেই তারা ইসলামের ছায়াতলে এসে দাঁড়িয়েছে। এরা সবাই পাশ্চাত্য জীবনধারা, পারিবারিক বিচ্ছিন্নতা ও নারীবাদীদের ব্যর্থ আন্দোলন সম্বন্ধে তসলিমা নাসরিনের চেয়েও অভিজ্ঞ। সবচেয়ে বড়কথা এরা পারিবারিক বাঁধন এবং ব্যক্তিগত নিরাপত্তা চায়। যে নিরাপত্তা পাশ্চাত্যের সুপার পাওয়ার একজন নারীকে দেয়ার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছে। যে সুইডেন তসলিমার আশ্রয়দাত্রী সেখানকার নারীদের জীবন কি সত্যি স্বাধীন? মেয়েরা কি সুখী? মা ও সন্তানের পারস্পরিক নির্ভরতা কি সে দেশে এখনও আছে? আমরা স্বীকার করি সেখানে নারীদের বল্গাহীন যৌনতার অবাধ স্বাধীনতা হয়তো আছে। কিন্তু মাতা মেরীর জীবনাদর্শ কি এ রকম ছিল? খৃস্টান রমণীকুল, আমরা জানি, অবাধ যৌন স্বাধীনতার পূজারী ছিলেন না। এখন পাশ্চাত্য সভ্যতা তাদের যেখানে পৌছে দিয়েছে সে জাহান্নাম থেকে ফিরে আসার তাদের কোনো উপায়ও নেই। তবুও আমরা গর্ভপাতের বিরুদ্ধে

www.pathagar.com

পোপের বিরোধিতা এবং কিছু খৃস্টান সাধুসন্তের আন্দোলনের কথা জানি বলেই আশা করি পাশ্চাত্যের শুভ বুদ্ধির উদয়হবে। সেখানেই তো অসংখ্য সাদা চামড়ার তসলিমা নাসরিন আকর্ষণ ও উদ্যম হারিয়ে মিডিয়াগুলোর দৃষ্টিতে হাস্যকর হয়ে উঠেছে, নাকি একজন কালো নারীবাদী ছাড়া আর চলছিল না? তসলিমাকে নিয়ে পাশ্চাত্য মিডিয়াগুলোর লোফালুফি এর মধ্যেই শেষ হয়ে গেল? আমরা ভেবেছিলাম ঐ ধুমসী লেখিকাকে অন্তত কয়েকটা মাস বুঝি টিভিওয়ালারা উল্টে-পাল্টে দেখাবে। সবি ফক্কিকার। তসলিমা যে প্রকৃতপক্ষে কোনো নয়নসুখকর দ্রষ্টব্য নয় তা আশা করি সুইডেনের বর্তমান সরকারও স্বীকার করবেন।

তাছাড়া তসলিমার সীমাহীন উচ্চাকাংক্ষা বৃদ্ধি করে যে তার নতুন পৃষ্ঠপোষকের খুব বেশী লাভ হয়েছে এমন মনে হয় না। মনে হয় খুব অস্বস্তির মধ্যে আছেন তারা। সম্প্রতি দর্শনীয় প্রাণী হিসেবে তাকে পাশ্চাত্যের লেখক সভা সম্মেলনে হাজির করার একটা হিড়িক পড়ে গেছে বলে শুনেছি। যেখানে সে যাচ্ছে সেখানে ঝাঁকে ঝাঁকে সাংবাদিক ও টিভি ক্যামেরার হামলে পড়া দেখে তার পৃষ্ঠপোষকগণ বেশ উৎসাহ বোধ করলেও তসলিমার বেয়াদবী ও নির্বুদ্ধিতা সেখানকার সাংবাদিক ও কবি-সাহিত্যিকদের মধ্যে অসহ্য হয়ে উঠেছে বলে সংবাদপত্রে খবর বেরিয়েছে।

সম্প্রতি পর্তুগালের রাজধানী লিসবনের একটি সাহিত্য সম্মেলনে তসলিমার বাগাড়ম্বরপূর্ণ বাক্যালাপে উপস্থিত সাংবাদিক এবং আত্মসম্মানবোধসম্পন্ন কয়েকজন কবি-সাহিত্যিক তার আচরণের প্রতিবাদ করে হল থেকে বেরিয়ে যান।

ঘটনার বিবরণে জানা গেছে যে, লেখক অধিবেশনের এক পর্যায়ে তসলিমা নাসরিন নিজেকে আত্মপ্রচারে বিমুখ বলে ঘোষণা দেয়। সে বলে যে সে পত্র-পত্রিকায় নিজের প্রচার চায় না এবং সাংবাদিকদের সে হল থেকে বেরিয়ে যেতে বলে। মুহূর্তের মধ্যেই সাংবাদিক ও কয়েকজন লেখক তার ধৃষ্টতার প্রতিবাদ জানিয়ে হল থেকে বেরিয়ে যান। ফলে সারা ইউরোপে বিষয়টি নিয়ে কানাঘুষা শুরু হয়েছে। যারা তসলিমাকে এসব বেয়াদবী শিখিয়েছে তারা এখন নিশ্চয় দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। যদিও আমরা জানি না এখন তাদের প্রতিক্রিয়া কি তবুও এটা বুঝতে পারি তসলিমাকে নিয়ে লাফালাফির সাধ তাদের অচিরেই মিটে যাবে। যে নারী আল্লাহ ও রসুল (সঃ) কে নিয়ে বিদ্রূপ করতে দ্বিধা করেনি তার পরিণাম কেবল সময়ের ব্যাপার মাত্র।

তসলিমার চমক সৃষ্টির দিন ক্রমাগত ফুরিয়ে আসছে বলে আমাদের বিশ্বাস। এখন পশ্চিমের শহরগুলোতে তাকে নিয়ে দূর দূর ছে ছে শুরু হয়ে যাবে। তার পৃষ্ঠপোষকগণ তাকে ত্যাগ করবে। যেমন কলকাতার লেখক-শিল্পীরা দাউদ হায়দারকে শেষ পর্যন্ত ছে ছে করে তাড়িয়ে দিয়েছিল। অথচ সে যখন ধর্মের বিরুদ্ধে অর্থাৎ ইসলামের বিরুদ্ধে লিখে দেশ থেকে বিতাড়িত হয়েছিল তখন কলকাতার ধর্মনিরপেক্ষ সাম্প্রদায়িক হিন্দু লেখকদের সে কি নাচানাচি। সকল আন্তর্জাতিক মিডিয়ায় তাকে

www.pathagar.com

দেশত্যাগী উদ্বাস্তু কবি হিসেবে তুলে ধরার সে কি চেষ্টা। কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না। দাউদ হায়দার এ দেশে যেমন একজন ব্যর্থ কবি হিসেবে ঘোরাফেরা করতো প্রবাসেও তেমনি আছে। দাউদ হায়দার তবুও পুরুষ বলে রক্ষা। তসলিমার পরিণাম হবে খুবই খারাপ।

তসলিমা নিজের পরিণাম সম্বন্ধে সম্ভবত খানিকটা আন্দাজ করতে চেষ্টাও করে। সে কারণেই সে দেশে ফেরার রাস্তা উন্মুক্ত রাখতে চায়। নইলে যে অবস্থায় সে দেশ থেকে পালিয়েছে সে পরিস্থিতিতে পড়লে কেউ দেশে ফেরার চিন্তাও করতো না। কিন্তু তসলিমা জানে তার খেলা কোথায় শেষ হবে। যেখানেই শেষ হোক, বাকী জীবনটাকে যে ভারের মত বইতে হবে এ বোধ নিশ্চয়ই আল্লাহর শত্রুদের মনেও উঁকি দেয়।

তসলিমা সালমান রুশদীর মত প্রতিভাবান লেখক হলেও এক কথা ছিল। খোদাদ্রোহিতার আগে সালমান রুশদী ইংরাজী ফিকশন পাঠকদের কাছে পরিচিতি হয়ে উঠেছিলেন নিজের প্রতিভার বলে। তার প্রচন্ড অর্থের লোভই তাকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায়। তার অর্থের প্রতি লোভ দেখে পেঙ্গুইনের মালিকপক্ষ তাকে ইসলাম ও রসূল বিরোধী রচনার জন্য নির্বাচন করে। তসলিমা সালমান রুশদী নয় তাকে আগে এ দেশের পাঠকই চিনতো না। কেবল ইসলাম বিরোধিতাই তাকে জগত বিখ্যাত হয়ে ওঠার সুযোগ সৃষ্টি করেছে। এখন সে শয়তানের অতিথি।

www.pathagar.com

তসলিমার নতুন তামাশা

তসলিমাকে নিয়ে ইউরোপের রাজধানীগুলোতে আবার বেশ মুখরোচক গালগল্প চালু হয়েছে। বাংলাদেশের এই কুখ্যাত নারীবাদী ও ইসলাম বিরোধী লেখিকাকে নিয়ে খেলতে গিয়ে ইউরোপীয় পার্লামেন্ট এবং তসলিমার আশ্রয়দাতা দেশ সুইডেন এখন একটু বেকায়দা পড়েছে। সুইডেনের রাজধানীতে এখন বেশ রসালো গালগল্প সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে। আমরা আগেই বলেছিলাম, তসলিমাকে নিয়ে তার ইউরোপীয় প্রোমোটাররা অচিরেই ক্লান্ত হয়ে পড়বে। আমাদের আন্দাজ যে সঠিক ছিল এখন তা ধীরে ধীরে উদঘাটিত হতে শুরু করেছে। তসলিমা নাসরিন নিজেকে একজন ইহুদী লেখকের স্ত্রী হিসেবে পরিচয় দিয়ে ইউরোপ ভ্রমণে বেরিয়ে ডেনমার্কের কোপেনহেগেন বিমানবন্দরে ধরা পড়ে। তসলিমা গ্লাউশম্যান নামক জনৈক ইহুদী লেখককে তার স্বামী হিসেবে উল্লেখ করায় ডেনিস কর্তপক্ষের সন্দেহের উদ্রেক হয়। কারণ গ্লাইশম্যান একেবারে অপরিচিত ব্যক্তি নন। তিনি সুইডেনের 'পেন'-এর সভাপতি। তাছাড়া গ্লাইশম্যানের নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে বিবাহিত একজন স্ত্রীও বর্তমান আছে। এ অবস্থায় তসলিমার সাথে যদি গ্লাইশম্যানের নতুন বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়ে থাকে তবে তা ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত দেশ ডেনমার্কেরও জানার কথা। যেখানে ইউরোপীয় পার্লামেন্টই তসলিমাকে সাহায্য করার জন্য আগে বেড়ে বাংলাদেশ সরকারকে তাদের সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছিল। আর সুইড়েন সরকার তাদের ঢাকাস্থ দূতাবাসকে নির্দেশ দিয়েছিলেন, বৈধ বা অবৈধ যেভাবেই হোক কূটনৈতিক চালবাজির মাধ্যমে তসলিমাকে বাংলাদেশের প্রচলিত আইনকানুনের বাইরে টেনে এনে তাকে ইসলামের বিরুদ্ধে পরিপূর্ণভাবে কাজে লাগাতে হবে।

একাজটি সুইডেনের বর্তমান ক্ষমতাসীন সরকার, তাদের ঢাকাস্থ কূটনৈতিক ব্যক্তিবর্গ ও স্থানীয় কিছু তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষতার ছদ্মবেশধারী ভারতীয় দালাল লেখক যারা প্রায় সকলেই কলকাতার আনন্দবাজার গোষ্ঠীর অনুগ্রহপুষ্ট এবং আনন্দ পুরস্কারের তকমা-আঁটা; বেশ সফলভাবেই করেছেন। শুধু আমাদের এটাই জানা ছিল না যে, তসলিমার সাথে ইহুদীদের কোনো সম্পর্ক আছে। সালমান রুশদীর স্ত্রী এক ইহুদী যুবতী। রুশদীর বিরুদ্ধে মৃদ্যুদন্ড ঘোষিত হলে ঐ ইহুদিনী সালমান রুশদীর সাথে তার সংশ্লিষ্টতা ভেঙে দিয়ে চলে যায়। সে ঠিক কাজই করে। কারণ সালমান রুশদীর রসূল নিন্দার শাস্তি শেষে তার ওপরও বর্তায় এই ভয়ে সে ভীত হয়ে স্বামীকে ত্যাগ করে পালায়।

www.pathagar.com

তসলিমার ইসলাম নিন্দা ও কুরআন পরিবর্তনের প্রস্তাব শুনেই আমাদের সন্দেহ হয়েছিল কেবল আনন্দবাজার গোষ্ঠীই নয়- নিশ্চয়ই এর পেছনে কোনো ইহুদীবাদীদের চক্রান্ত কাজ করছে। নইলে তসলিমা নাসরিনের মত নামগোত্রহীন একজন বাংলাদেশী লেখিকার জন্য কেন ইউরোপীয় পার্লামেন্ট, কেন্দ্রীয় পেন এবং সুইডেন সরকারের এমন মাথা ব্যথা? এখন সবটা ব্যাপারই বিশ্বের ক্ষুব্ধ মুসলিম জনগণের কাছে স্পষ্ট হবে। এখন সবাই জেনে গেছে জরায়ুর স্বাধীনতাবাদিনী তসলিমা আসলে সুইডেনের একজন বিখ্যাত ইহুদী লেখকের ধর্মপত্নী। মিসেস গ্লাইশম্যান। এই গ্লাইশম্যানই সুইডেনের পেন প্রেসিডেন্ট। এই পরিচয়েই তসলিমা ইউরোপ ভ্রমণে বেরিয়ে কোপেনহেগেনে জেরার সম্মুখীন হয়ে কুপোকাত হয়েছে। ঐ ইহুদী ভদ্রলোকের যে আবার একটি জলজ্যান্ত স্ত্রী বর্তমান? ইউরোপে বাস করে একই সাথে কোনো ইউরোপীয় নাগরিকের কি করে দুটি স্ত্রী রাখা সম্ভব? আর দ্বিতীয় স্ত্রীটি যেখানে তসলিমা নাসরিনের মতই বিখ্যাত মহিলা! এ ব্যাপারে নিশ্চয়ই ইউরোপীয় পার্লামেন্ট এবং সুইডেনের প্রধানমন্ত্রী তসলিমাকেই সমর্থন করবেন। এতদিন যেমন করে এসেছেন। গ্লাইশম্যানের উচিত তার আগের মাদামটিকে এক্ষুণি তালাক দিয়ে তসলিমাকে নিজের স্ত্রী বলে ঘোষণা দওয়া। এতক্ষণে আমরা সুইডেনের ঢাকাস্থ কূটনৈতিকদের সর্বপ্রকার কূটনৈতিক তৎপরতার মর্ম বুঝতে পারলাম। তারা তাদের দেশের একজন খ্যাতিমান লেখকের স্ত্রীর পক্ষে দাঁড়াবেন না তো কার পক্ষে দাঁড়াবেন? ধর্মদ্রোহিতার মামলা মুলতবী রেখে এজন্যই কি তসলিমাকে সুইডেনে তড়িঘড়ি করে পার করে দেওয়া হয়েছিল?

আমরা শুনেছি বাংলাদেশ 'পেন'-এর প্রেসিডেন্ট প্রফেসর সৈয়দ আলী আহসান পর্তুগালের রাজধানী লিসবনের লেখক সম্মেলন বা পার্লামেন্টে নিমন্ত্রিত হয়েও যাননি। কারণ তসলিমাকে নিয়ে আন্তর্জাতিক কেন্দ্রীয় পেন কর্তৃপক্ষের সাথে তার মত বিরোধ রয়েছে। কেন্দ্রীয় পেন প্রেফেসর আহসানকে ক্রমাগত চাপ দিয়েও তসিলমাকে সমর্থনে সম্মত করাতে পারেননি। তিনি তসলিমাকে লেখকের মর্যাদা দিতেই অস্বীকৃতি জানিয়ে আসছিলেন। তদুপরি তসলিমার প্রকৃত পরিচয়, লেখক হিসেবে 'লজ্জার' মত বাজে বই লেখে ভারতে দাঙ্গা সৃষ্টির চেষ্টা ভারতের সবচেয়ে সাম্প্রদায়িক শক্তি বিজেপি ও আনন্দবাজার কর্তৃক তসলিমার পৃষ্ঠপোষকতা ইত্যাদি বিষয় বাংলাদেশ পেন কেন্দ্রীয় পেনকে খোলাখুলি জানিয়ে দেয়। ফলে তসলিমা বিষয়ে আপোস রফার জন্যই সম্ভবত প্রফেসর আহসানকে সম্মেলনে আমন্ত্রণ জানান হয়। কিন্তু সম্মেলনে তসলিমাকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে শুনে প্রফেসর সৈয়দ আলী আহাসন তাঁর সফর বাতিল করে দেন। এখন দেখা যাচ্ছে প্রফেসর আহসান সেখানে যোগদান না করাটা বাংলাদেশের লেখকদের জন্য ভালই হয়েছে।কারণ ঐ সভায় তসলিমা দেশ-বিদেশের লেখক, সাংবাদিকদের প্রতি এমন অপমানজনক বাক্যবাণ নিক্ষেপ করে যে মার্কিন লেখক টনি মরিসনের মত বিখ্যাত ব্যক্তিও দারুণ অস্বস্তি মনোভাব ব্যক্ত করে হল থেকে বেরিয়ে যেতে বাধ্য হন। হবে না, তসলিমা এখন আর আনন্দবাজারের সেই 'বাধা' হয়ে থাকার

www.pathagar.com

অবস্থায় নেই। এখন সে মাদাম গ্লাইশম্যান। সারা দুনিয়া থেকে দূর দুর করে তাড়িয়ে দিলেও সুইডেন তো আছে! সেখানে না টিকতে পারলে তার নতুন নায়কের প্রমিজ ল্যান্ড ইজরাইল তো আছেই। ওহ্ জেরুসালেম!

আর অতদূরই বা যাওয়ার দরকার কি? বালাদেশ আছে না! আর আছে সুইডেনের ঢাকাস্থ কূটনৈতিক অতি উৎসাহী প্রতিনিধিরা। এরা জানে তসলিমা বাংলাদেশের আইন-কানুনকে যতই বুড়ো আঙুল দেখাক এদেশের সরকারের সাধ্য নেই ইউরোপীয় পার্লামেন্টের বরখেলাপ বা সুইডেনের স্থানীয় কূটনীতিকদের ইচ্ছার বিপরীতে তসলিমার দেশদ্রোহিতা ও ইসলাম বিরোধিতার জন্য কোনো রূপ আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করে। সরকার ইউরোপীয় পার্লামেন্টের ধমক এবং সুইডেনের ঢাকাস্থ কূটনৈতিক ব্যক্তিদের ধমকের কাছে মাথা নত করেই তাকে দেশ ত্যাগের সুযোগ দিয়েছে এবং আবার তাদের ধমকের ভয়েই তাকে বাংলাদেশে প্রবেশের পথও খুলে দেবে। আর আটকাবেই বা কোন যুক্তিতে? সরকারই তো দেশবাসীকে অবহিত করেছিল তসলিমা বাংলাদেশের নাগরিক, বৈধ পাসপোর্ট নিয়েই সে বিদেশে গেছে।

এখন ইউরোপে যদি তসলিমার ভেলকি শেষ হয়ে গেছে বলে সুইডেন ও ইউরোপীয় পার্লামেন্ট মনে করে তবে সে দেশে ফেরার ব্যাপারে কার তোয়াক্কা করবে? তসলিমা তখন তো আনন্দবাজার গোষ্ঠীর বিচিত্র আবিষ্কার মাত্র ছিল। এখন সে মাদাম গ্লাইশম্যান।

আনন্দবাজার গোষ্ঠী ও তসলিমার ঢাকার সমর্থক ও গুণগ্রাহীরা অবশ্য অতটা আন্দাজ করতে পারেনি যে, তসলিমা তাদের মাথা ছাড়িয়ে সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়বে। আনন্দবাজারীরা শুনেছি এখন রীতিমত চিন্তিত। তসলিমা না আবার কলকাতার তথাকথিত কবি ও কথাশিল্পীদের সকলকে বামনে পরিণত করে নিজেই উপমহাদেশের মহামানবীতে পরিণত হয়ে যায়। তারা অবশ্য অতটা সহ্য করতে পারবেন না। ব্রাহ্মণেরা শেষে পেট ফেটে মরে যাবেন। এক মুসলমালিনীকে তারা ধর্মচ্যুত করে তাদের ইচ্ছেমত নাচাতে চেয়েছিলেন। চেয়েছিলেন ভারত, বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের ইসলামী আন্দোলনকে ক্ষুব্ধ করতে। কিন্তু তসলিমা যে কলকাতার আনন্দবাজারী বামুনদের চেয়েও অনেক পাকা খেলোয়াড় তা তারা আন্দাজ করতে পারলে কখনও এ কাজ করতেন না। তসলিমা বুঝতে পেরেছে আনন্দবাজারী বামুনরা আসলে কূয়োর ব্যাঙ। তাদের মুরদ কতখানি তা তসলিমার জানা হয়ে গেছে। এখন সে ইহুদী জায়নবাদীদের নির্দেশে নাচার জন্য নিজেকে তৈরী করে নিয়েছে।

তসলিমার সাম্প্রতিক চমক সৃষ্টিতে সারা পাশ্চাত্য জগতে গুঞ্জন উঠলেও কলকাতার আনন্দবাজারীরা একদম চুপ মেরে গেছে। সে যে মাদাম গ্লাইশম্যান সেজে কোপেনহেগেনে ধরা খেয়ে নাজেহাল হয়েছে এ খবর জগতের সকল সংবাদপত্রে প্রকাশ পেলেও আনন্দবাজার পত্রিকায় এর ছিটেফোঁটাও ছাপা হয়নি। আর ঢাকার তসলিমা সমর্থকরা মুখে কুলুপ এঁটে বসে আছে। তাদের ভয়, এতদিন তারা তসলিমাকে সমর্থন করে যত বক্তৃতা বিবৃতি ঝেড়েছেন এর পরিণাম না আবার তাদের দিকে গড়ায়। কারণ তসলিমার পবিত্র কুরআন বিরোধিতার কারণ এখন দেশবাসীর কাছে স্পষ্ট, তসলিমা

www.pathagar.com

একজন ইউরোপীয় ইহুদী স্ত্রী। আর জনৈকা ইহুদী বধূর পবিত্র কুরআনের বিরুদ্ধে আক্রোশ তো থাকতেই পারে।

এখন কথা হলো, সুইডেনের ঢাকাস্থ কূটনৈতিক প্রতিনিধিরা মাদাম তসলিমা গ্লাইশম্যান সম্বন্ধে নতুন কি মতলব আঁটছেন তা বাংলাদেশের এগারো কোটি মুসলমান নর-নারীর জানতে কৌতূহল হওয়া খুবই স্বাভাবিক। তসলিমা সুইডেনের সচেতন নাগরিকদের কাছেও নাকি দারুণ কৌতূহলের বিষয় হয়ে উঠেছে। সবারই প্রশ্ন তসলিমা যে নিজেকে সেখানকার 'পেন' প্রেসিডেন্ট গ্লাইশম্যানের বিবাহিত স্ত্রীর পরিচয়ে ইউরোপ সফর করে বেড়াচ্ছে এতে মিঃ গ্লাইশম্যানের সম্মতি আছে কিনা? আমাদের ধারণা তসলিমা অত কাঁচা মেয়ে নয়। সে তার আশ্রয়দাতার নাম তার সম্মতি ছাড়া স্বামী হিসেবে ব্যবহার করতে পারে না। নিশ্চয়ই গ্লাইশম্যানের সাথে তসলিমার সম্পর্ক এমন পর্যায়ে আছে যাতে সে নির্ভয়ে তাকে স্বামী হিসেবে কাগজেপত্রে অর্থাৎ ভ্রমণ ডকুমেন্টে উল্লেখ করার অধিকার পেয়েছে। যদি সত্যি গ্লাইশম্যানের আরও একজন স্ত্রী থেকে থাকে তবে তাকে তালাকপ্রাপ্তা বলেই এখন ধরে নিতে হবে। নতুন স্বামী নিয়ে যাতে তসলিমাকে কোনো ঝামেলায় পড়তে না হয় সেটা নিশ্চয়ই সুইডেনের ঢাকাস্থ কূটনৈতিক প্রতিনিধিরা দেখবেন! তাছাড়া সুইডেনের প্রধানমন্ত্রীও আশা করি তসলিমার পক্ষে দাঁড়াবেন যেমন কিছুদিন আগে তিনি সর্বপ্রকার আন্তর্জাতিক শালীনতা লংঘন করে, এগারো কোটি বাঙালী মুসলমানের বিক্ষোভকে উপেক্ষা করে তসলিমাকে তার দেশের মাটিতে আশ্রয় দিয়েছিলেন। তখন যেমন তারা লেখকের স্বাধীনতার নামে তসলিমার পক্ষে দাঁড়িয়েছিলেন, এখন তেমনি প্রেমের স্বাধীনতা কিংবা তসলিমার জরায়ূর স্বাধীনতার পক্ষে দাঁড়াবেন।

সুইডেনের ঢাকাস্থ কূটনৈতিক প্রতিনিধি যারা একটি দরিদ্র দেশের স্বাধীনতা ও এর ধর্মীয় বিশ্বাসকে প্রকাশ্যে অবমাননা করে তসলিমাকে নিজের দেশে নিয়ে গেলেন এবং তাকে আশ্রয় ও প্রশ্রয় দিয়ে সারা জগতের কাছে বাংলাদেশের ভাবমূর্তিকে ক্ষুণ্ন করেছেন এখন তারা তসলিমার নতুন পরিচয় সম্বন্ধে কি বলেন, আমরা তা জানতে আগ্রহী। তসলিমার ধূর্তামি সম্বন্ধে বাংলাদেশ সরকার এবং জনগণ অবহিত। সে এর আগেও ভারতে যাওয়ার কালে পাসপোর্টে নিজের পরিচয় গোপন করেছিল। আন্তর্জাতিক চক্রান্তের হস্তক্ষেপের ফলে সে যাত্রা সে বেঁচে যায়। তাকে যারা নির্যাতিতা লেখিকা হিসেবে জগৎ সভায় তুলে ধরেছে এখন তাদের কাছে তার প্রতারণা ধরা পড়েছে। আমরা এখন দেখতে চাই তসলিমাকে নিয়ে ইসলাম বিদ্বেষী সুইডেন এবং ইহুদীবাদীরা আর কতদূর যেতে চায়? আমাদের তো ধারণা তসলিমার গ্ল্যামার তাদের কাছে আর অবশিষ্ট নেই। অচিরেই তারা তাকে ঢাকায় ফেরত পাঠাবার ছুঁতো খুঁজে বের করবে। আর তসলিমাও জানে, এসব ব্যাপারে সুইডেন তথা ইউরোপীয় পার্লামেন্ট কতটা নির্লজ্জ। তারা চক্ষুলজ্জার ধার ধারে না।

১২/১০/৯৪

www.pathagar.com

সংসদে 'দ্বিতীয় তসলিমা' প্রসঙ্গ

আমাদের সমাজে এমন কয়েকজন মহিলা আছেন যারা যে কোনো উপায়ে সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় নিজের নাম প্রকাশ পেলে আনন্দে আটখানা হয়ে যান। তাদের ছবি কদাচ পত্রিকার পৃষ্ঠায় ছাপা হয়। ছবি ছাপা যায় না কারণ সম্ভবত ছবি ছাপার বয়েস তারা পার হয়ে এসেছেন কিংবা অনেকের চেহারা আবার ছাপার একেবারেই অযোগ্য বলে সংবাদপত্রের আলোকচিত্রীরা মনে করেন। অনেকের চেহারা মোবারক তাদের কর্মতৎপরতার সাথে খাপ খায় না। তারা মাঝেমধ্যে বালিকা সুলভ যেসব বিতর্ক সৃষ্টি করেন, তাদের মধ্য বয়েসী বয়োবৃদ্ধ মুখের সাথে সেসব চাঞ্চল্যপূর্ণ চপল ভঙ্গী ও কথাবার্তার সামঞ্জস্য বিধান করা যায় না। ফলে চেহারার বদলে তাদের বিতন্ডার খানিকটা অংশই সংবাদপত্রে ছাপা হয়। খানিকটা ছেপেই নিউজ পেপারগুলো তাদের কর্তব্য সম্পাদন করে। যতই বিতর্কমূলক হোক সংবাদ তো আর চেপে যাওয়া যায় না।

এসব বিতন্ডা সৃষ্টিকারিণীদের মধ্যে তসলিমা নাসরিনই দেশে-বিদেশে বেশী প্রচার পেয়েছে। কারণ তসলিমা পবিত্র কুরআনই পাল্টে ফেলার প্রস্তাব করায় বিশ্বের ইহুদী-খৃস্টানদের দ্বারা পরিচালিত মিডিয়া সাম্রাজ্য তাকে লুফে নিয়েছিল। আর তসলিমার বয়েস অপেক্ষাকৃত কম হওয়ায় তার চেহারারও হয়তবা শয়তানদের মধ্যে খানিকটা কদর ছিল। সে কারণেই ভারত ও পাশ্চাত্যের পত্র-পত্রিকায় এবং টেলিভিশনে তসলিমার চেহারা দেখাবার একটা তোড়জোড় পড়ে গিয়েছিল। যদিও তা ছিল খুবই অল্পকালের জন্য। এখন কেউ আর তসলিমাকে তেমনভাবে পুছে না। সে কোথায় কি করছে এ নিয়ে কারো কোনো মাথা ব্যথা নেই। মাথা ব্যথা থাকত যদি তসলিমা বাংলাদেশে বসে ইসলামের বিরুদ্ধে এবং এখানকার মুসলিম জনগণের সমাজ সভ্যতা ঐতিহ্যের বিরুদ্ধে খোঁচাখুঁচি করার সুযোগ পেত। ইউরোপে বসে ইসলামের বিরুদ্ধে কিংবা পবিত্র কুরআনের বিরুদ্ধে প্রচার চালিয়ে খুব বেশী প্রচার পাওয়া যায় না। সবাই জানে ইউরোপে এ ধরনের প্রচারণা যুগ যুগ ধরে চলে এসেছে। ক্রুশেডে সম্পূর্ণভাবে পরাজয়ের পর পাশ্চাত্যের খৃস্টান জগতের এটাই ছিল প্রতিশোধ মেটানোর পদ্ধতি। এতে নতুন কিছু নেই। ইসলামী দেশগুলোর ভিতরে থেকে মুসলিম সমাজ অভ্যন্তরে ইসলাম বিরোধিতার যে মূল্য ইসলামের শত্রুরা দিয়ে থাকে, পাশ্চাত্যের কোনো ধর্মনিরপেক্ষ নাগরিকের আশ্রয়ে নিরাপত্তা থেকে ইসলামের কুৎসা রটনায় এতটা দাম পাওয়া যায় না। স্ক্যান্ডিনেভিয়ান দেশগুলো বা জার্মানীতে এখন তসলিমা কি করে বেড়াচ্ছে এ নিয়ে পাশ্চাত্য মিডিয়াগুলোর কোনো কৌতূহল নেই। আমরা যতদূর জানি,

www.pathagar.com

সেখানে তসলিমার জীবন একঘেয়ে এবং এর মধ্যেই সে খানিকটা পরিত্যক্ত। ইসলাম ও পবিত্র কুরআনের বিরুদ্ধে বলে এবং সাক্ষাৎকার দিয়ে সে যে বিপুল অর্থ কামিয়েছিল এখন সেই অর্থেই সে জীবন ধারণ করছে। সে ভান্ডারও একটু একটু করে কমে আসছে বলেই এখন সে দেশে ফেরার উপায় খুঁজছে। যে কোনো মূল্যেই হোক তসলিমা এখন দেশে ফিরতে চায়। কিন্তু এ দেশের মানুষ তার দেশত্যাগে হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছে। এ দেশের এগারো কোটি মানুষই ভাবে এ আপদ যারা সৃষ্টি করেছে এখন তারাই বুঝুক মালটা কেমন! এমন কি যারা কিছুদিন আগে আরেক মাল দাউদ হায়দারের সাথে তসলিমার বিয়ের গুজব ছড়িয়েছিল তাদের বিরুদ্ধে দাউদ হায়দারের প্রতিক্রিয়া হল, এ বিয়ের গুজবে তার সম্মানের হানি হয়েছে। তসলিমার সাথে দাউদের মত লোকও নিজেকে জড়াতে লজ্জা পায়। তারও আত্মসম্মান আহত হয়। এই হল ইউরোপে স্বদেশত্যাগী কিংবা মুসলিম জনগণের ধিক্কারে পলায়নপর মুরতাদদের অবস্থা। মিডিয়াগুলোর কাছে তাদের প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে। এখন তারা ঝরাপাতা মাত্র। এক প্রান্তর থেকে অন্য শূন্য প্রান্তরে বাতাসে উড়ে বেড়ায়। কেউ পাত্তা দ্যায় না।

এরাই কিছুদিন আগে ইসলামের বিরুদ্ধে পাশ্চাত্য ও হিন্দু ফ্যাসিস্টদের প্ররোচনায় নিউজ মেকার দৈত্য বা দানবী হয়ে উঠেছিল। এরা সকলেই এক একজন সালমান রুশদী হয়ে উঠতে চেয়েছিল। কিন্তু আল্লাহ তার শত্রুদের একটু একটু করে আবার বামনে পরিণত করে দিয়েছেন। কিছুদিনের মধ্যেই এরা পিঁপড়ের চেয়েও অধম, অকিঞ্চিৎকর হয়ে মাটিতে মিশে যাবে। অথচ আল্লাহর ধর্ম যেমন ছিল তার চেয়েও দ্বিগুণ তিনগুণ গতি নিয়ে মানব জাতির অশান্ত ও অসুখী জনবসতিতে শান্তি ও সান্ত্বনা বিতরণ করতে থাকবে।

আমরা নিবন্ধের শুরুতে আমাদের সমাজের কয়েকজন প্রচার প্রিয় মহিলার কথা দিয়ে শুরু করেছিলাম। এরা সকলেই এখনও তসলিমা হয়ে উঠতে ব্যর্থ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। সম্প্রতি বাংলাদেশের একতরফা বা একদলীয় পার্লামেন্টে গুরুত্বপূর্ণ বাজেট অধিবেশনকে উত্তপ্ত কিংবা প্রাণচঞ্চল করতে এমপি মিসেস ফরিদা রহমান আবার সংবাদপত্রের হেডলাইন হয়ে উঠেছেন। এবার তিনি মুরতাদদের সমর্থনে বাজেট বক্তৃতা দিতে গিয়ে স্বদলীয় এমপি জনাব মশিউর রহমানের তীব্র সমালোচনার সম্মুখীন। এ নিয়ে পার্লামেন্টে তুমুল উত্তেজনার খবর পাওয়া গেছে। কে বলে পার্লামেন্টে বিরোধী দল না থাকলে উত্তেজনা সৃষ্টি কিংবা অধিবেশন প্রাণবন্ত হয় না? প্রমাণ করেছে এরা বিরোধী দল না থাকলেও উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। দলে কেবল ফরিদা রহমানের মত এক-আধজন এমপি থাকলেই যথেষ্ট। তিনি একাই বাজিমাৎ করে দিতে পারেন।

বাজেট আলোচনায় অত্যন্ত অপ্রাসঙ্গিকভাবে ফরিদা রহমান জনৈক ইসলাম বিদ্বেষী কবিকে টেনে এনে অভিযোগ উত্থাপনের সুরে বলেন যে, এই কবিকে কেন মুরতাদ বলা হচ্ছে? এই প্রশ্ন তুলেই উক্ত কবির সমালোচকদের সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠী

www.pathagar.com

আখ্যা দিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেন। তার বক্তব্যের বিষয় ছিল 'ধর্মান্ধ' ব্যক্তিরা নাকি এ দেশের কবি-সাহিত্যিকদের মুতরাদ আখ্যা দিচ্ছে। তিনি ঐ কবিকে মুরতাদ বলায় তার লজ্জা রাখার ঠাই তিনি খুঁজে পাচ্ছেন না।

মিসেস ফরিদা রহমানের কথায় এনজিওদের প্রতিও তার দরদ উপচে পড়েছে। তিনি বলেছেন, এনজিওরা কত উপকার করছে অথচ মৌলবাদীরা তাদেরও বিরুদ্ধে নেমেছে। তার আরও আক্ষেপ প্রকাশ পেয়েছে মুক্তিযোদ্ধাদের নীরবতায়। তিনি বলেছেন, কথায় কথায় ওরা মুরতাদ ঘোষণা করছে অথচ মুক্তিযোদ্ধারা নীরব।

সম্ভবত ফরিদা রহমানের ধারণা মুক্তিযোদ্ধাদের প্রধান কাজ হল ইসলামের অনুসারীদের ওপর হামলা করা। ফরিদা রহমান হয়ত ধরে নিয়েছেন তিনি যে কবির জন্য পার্লামেন্ট সরগরম করে তুলতে প্রয়াস পেয়েছেন তিনিও একজন মুক্তিযোদ্ধা। ফরিদা রহমানের জানা উচিত, যাকে মুরতাদ বলায় ফরিদা রহমান এতোটা উত্তেজিত হয়ে পড়েছেন তিনি মুক্তিযুদ্ধের সময় মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করেছিলেন। তৎকালীন 'দৈনিক পাকিস্তান' নামক পত্রিকায় নিত্য সম্পাদকীয় লিখে পাক বাহিনীর কাজকে সমর্থন করেছিলেন। এখন তিনি আওয়ামী লীগের আঁচলের নীচে আশ্রয় গ্রহণ করলেও উনসত্তুরের গণ আন্দোলনের সময় শেখ মুজিবের তীব্র সমালোচক এবং ছ'দফার বিরোধী ছিলেন। তার একমাত্র কাজ ছিল জাতীয়তাবাদী আন্দোলন এবং জতীয়তাবাদী কবি-সাহিত্যকদের নিন্দা করা। এখন যারা ঐ কবিটির সহযোগী তাদের প্রায় সকলেই ছিলেন পাকিস্তান রাইটার্স গিল্ডের সদস্য। আদমজী পুরস্কারের লোভে এরা প্রায় সকলেই বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদীদের বিরুদ্ধে কলম ধরেছিলেন এবং পাক-ভারত যুদ্ধের সময় এরা দলবদ্ধভাবে তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তানের খেমকারান সেক্টরে গিয়ে পাকিস্তানীদের আত্মত্যাগের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে নানারূপ প্রবন্ধ-নিবন্ধ কবিতা লিখেছিলেন। পুরানো পত্রিকার ফাইল ঘাঁটলে এখনও এদের দালালির স্বরূপ উদঘাটন সম্ভব। আর যে কবিটিকে মুরতাদ বলায় ফরিদা রহমানের এত গাত্রদাহ তিনিই প্রথম আজানের বিরুদ্ধে কাব্য রচনা করে কুখ্যাতি অর্জন করেছিলেন। যার জের আজও চলছে। আজ সিলেটের মাটি ঐ মুরতাদের জন্য নিষিদ্ধ কেন, ফরিদা রহমান কি তা জানেন না? নাকি জেনেও না জানার ভান করছেন? না জানলে ফরিদা রহমানের জ্ঞাতার্থে জানিয়ে দেয়া প্রয়োজন, সিলেটের পবিত্র মাটি আবাদ হয়েছিল একজন মুসলিম মুজাহিদের আজান ধ্বনিতে। এ জন্যই এ দেশের প্রত্যেক ইসলাম বিরোধী বুদ্ধিজীবী ও লেখক আজানের শব্দে অস্বস্তিবোধ করে। কথায় কথায় ফরিদা রহমানদের কেউ মুরতাদ ঘোষণা করেনি। ফরিদা রহমানের তথাকথিত কবি-সাহিত্যিদের সমগ্র জীবনের কার্যকলাপ এবং রচনাবলী জনগণের সামনেই আছে।

অতীতে পার্লামেন্টে বিএনপি'র কতিপয় সদস্যের ইসলাম বিরোধী কার্যকলাপ, ইসলামী রাজনীতি নিষিদ্ধ করার প্রয়াসের ঘটনা এ দেশের কোনো নাগরিকেরই ভুলে

www.pathagar.com

যাওয়ার কথা নয়। ফরিদা রহমানও নিশ্চয়ই ভুলে যাননি। এ দেশের কোটি কোটি মুসলিম ভোটারের ভোট বিএনপি পেয়েছিল তাদের বিসমিল্লাহ্ উচ্চারণ কিংবা সংযোজনের আশ্বাস পেয়েই। কিন্তু ফরিদা রহমানরা প্রমাণ করেছেন তারা ধর্মের নামে ধোঁকা দিতেই মাঝেমধ্যে ঈমানদারীর আলখেল্লা গায়ে দিয়ে ইসলামের উচ্ছেদে সক্রিয় রয়েছেন।

আমরা অবাক হয়েছি বিনএপিতে মশিউর রহমানের মত তরুণ এমপিরা কি করে এখনও আছেন? মশিউর রহমান ফরিদা রহমানের বক্তব্য সহ্য করতে পারেননি। তিনি ফরিদা রহমানের বাজেট সংক্রান্ত বক্তব্যে অযাচিত প্রসঙ্গ উত্থাপন করে মুরতাদদের সমর্থন করতে থাকায় সরাসরি এর প্রতিবাদ করেছেন। ফরিদা রহমান যে 'দ্বিতীয় তসলিমা' সাজার ব্যর্থ চেষ্টা করছেন এ কথা মশিউর চেপে রাখতে পারেননি। বেশ কিছুদিন ধরে ফরিদা রহমান দ্বিতীয় তসলিমা রূপে আখ্যায়িত হওয়ার জন্য ইসলাম বিরোধী কথাবার্তা শুরু করেছেন। কিছুকাল আগে কোথায় যেন তিনি এক সেমিনারে মুসলিম পারিবারিক আইন ও বিয়েশাদী নিয়ে অযথার্থ কথাবার্তা বলে বিতর্ক সৃষ্টির প্রয়াস পেয়েছিলেন। কিন্তু এ দেশের মুসলিম জনগণ তাকে বেশী পাত্তা না দেয়ায় তিনি দ্বিতীয় তসলিমা হওয়ার সুযোগ পাননি। তাহলেও ইসলামী আন্দোলনের বিরুদ্ধে তার মুখ বন্ধ নেই। জনগণ এ নিয়ে বেশী উচ্চবাচ্য করছে না। কারণ আগামী নির্বাচনেই এইসব ধর্মদ্রোহীদের রাজনৈতিক মঞ্চ থেকে সরিয়ে দেয়ার সুযোগ আসছে। বিএনপি'র এমপি মশিউর রহমান ফরিদা রহমানের মুরতাদ সমর্থনের অযাচিত বক্তব্যে সম্ভবত একটু ক্ষুব্ধই হয়েছেন। কিন্তু বিএনপিতে এ ধরনের ইসলাম বিদ্বেষীর সংখ্যাইতো অপেক্ষাকৃত বেশী। মশিউরের বক্তব্যের সময় যারা টেবিল চাউপড়িয়ে তাকে সমর্থন দিচ্ছিলেন তাদের আন্তরিকতা প্রশ্নাতীত হলেও বিএনপির কলকাঠি যারা নাড়েন তারা কিন্তু মিসেস ফরিদা রহমানেরই সমর্থক। তবুও মশিউর রহমান যে সাহস করে ফরিদা রহমানকে দলীয় আদর্শে বিশ্বাস না থাকলে পদত্যাগ করতে বলেছেন, এটা খুবই সাহসের পরিচয়। আমরা ভয় পাচ্ছি এই স্পষ্ট কথার জন্য ঝিনাইদহ থেকে নির্বাচিত তরুণ এমপি সাহেবকে না আবার খেসারত দিতে হয়?

মশিউরের তারুণ্যভরা বক্তব্যে ঈমানের তেজ আছে সন্দেহ নেই। মশিউর বলেছেন, ফরিদা রহমান সংসদে প্রায়শই ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষমূলক কথাবার্তা বলেন। বিএনপির এমপি হিসেবে ফরিদা রহমান সংসদে ইসলামকে হেয় প্রতিপন্ন করে বক্তব্য দিতে পারেন না। মশিউর আরও বলেন, বিএনপি কোনো তসলিমা নাসরিনকে লালন করবে না। বিএনপিতে আমরা কোনো তসলিমা নাসরিন চাই না।

এভাবেই বিএনপির একদলীয় পার্লামেন্টে খানিকটা উত্তেজনা সৃষ্টি হলেও ডেপুটি স্পীকার হুমায়ুন খান পন্নী আশ্বাস দিয়ে বাক-বিতন্ডার পরিসমাপ্তি ঘটান।

www.pathagar.com

আমরা মনে করি, বিএনপির ঐ তরুণ এমপি জনাব মশিউর রহমান একজন সাদাসিধে ঈমানদার গণপ্রতনিধিদের ভূমিকাই পালন করেছেন। নইলে আমরা যতদূর জানি বিএনপিতে বর্তমানে ফরিদা রহমানদেরই তো সংখ্যাধিক্য। সেখানে তো মশিউর রহমানদের কথা বেশী পাত্তা পাওয়ার পরিবেশ নেই। ফরিদা রহমান যে মুরতাদ কবির সমর্থনে সংসদে ইসলামী আন্দোলনের সমগ্র পটভূমিটাকে সাম্প্রদায়িক, মৌলবাদী ইত্যাদি আখ্যায় আখ্যায়িত করে বক্তৃতা করলেন, তিনি ভাবতেও পারেননি বিরোধী দলের অনুপস্থিতকালে কেউ ইসলামের পক্ষে দাঁড়িয়ে তার ইসলাম নিন্দার জবাব দেবেন। তিনি বিভিন্ন সেমিনারে ইসলাম বিরোধী বক্তব্য দিয়ে ইতিপূর্বে গোলযোগ পাকিয়ে এলেও সর্বত্রই তীব্র সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছেন। এবার তিনি ভেবে ছিলেন বিরোধী দলহীন পার্লামেন্ট হবে তার জন্য খোলা মাঠ। কেউ তার ইসলাম নিন্দার প্রতিবাদী হওয়ার সাহসী হবে না। তার ধারণা ঠিকই ছিল। কারণ আমরাও জানি বর্তমানে বিএনপিতে ইসলামের পক্ষে দাঁড়াবার সাহস কারো নেই। কোত্থেকে যে ঝিনাইদহের এই তরুণ সাদাসিধে এমপিটি বলা নেই কওয়া নেই খাড়া হয়ে গেলেন এবং ফরিদা রহমানের এই আটঘাট বাঁধা বাজেট বক্তৃতাটির মূল উদ্দেশ্য ছত্রখান করে দিলেন! তা আল্লাহ মালুম। কথায় বলে না আল্লাহর মার দুনিয়ার বার। মশিউর রহমানের দ্বারা যেন সেটাই দৈবভাবে সাধিত হল। এখন মশিউরের সমস্ত বক্তব্যটিও যদি এ্যাক্সপাঞ্জ হয়ে যায় এতে তার আক্ষেপ করার কিছু নেই। জনগণের প্রশংসার খাতায় তার বক্তব্যটি চিরস্থায়ী অক্ষর হয়ে বসে গেছে।

৩০/৬/৯৫

www.pathagar.com

এক ইতির ইতিকথা

বাংলাদেশ টেলিভিশনের একটি অনুষ্ঠানে নারী নির্যাতনের একটি সচিত্র বিবরণ দেখেছিলাম। অসহনীয় ঘটনা। সপরিবারেই টেলিভিশনের সামনে বসেছিলাম। এমন মর্মান্তিক বিষয় দেখানো হবে জানলে আমি পরিবারের অল্প বয়েসী ছেলেমেয়ে এবং কৌতূহলী শিশু দু'টি নাতিকে সরিয়ে নিয়ে যেতে বলতাম। মানুষের নিষ্ঠুরতা যে কোনো কোনো ক্ষেত্রে পশুকেও হার মানায় আমি চাই না যে তা আমার পরিবারের অল্প বয়স্ক ছেলেমেয়ে এবং শিশুরা জানুক। কারণ আমরা এতদিন ছেলেমেয়েদের মানুষের কেবল মহৎ গুণাবলীর কথাই অহরহ বলে এসেছি। তা বলে মানুষের কোনো খারাপ কাজের কথা যে এরা জানে না, এমন তো নয়। ছোটো হলেও এ শহরের স্কুল-কলেজে যখন পড়ে, এ শহরের পথে-ঘাটে যখন চলাফেরায় এরা অভ্যস্ত, দৈনিক পত্রিকাগুলো যখন নিত্য এদের পাঠ্য, তখন এ কথা বলা যাবে না মানব চরিত্রের খারাপ দিকগুলো সম্বন্ধে এরা অজ্ঞ। এরা হয়ত সবি জানে সবি বোঝে। এমন ব্যাপারও থাকতে পারে পরিবারের মুরুব্বীদের চেয়ে বরং কিশোর ও তরুণরাই বাংলাদেশের সমাজ পরিস্থিতিকে অধিক জানে। তবুও টেলিভিশনে দেখা সেই ভয়াবহ নারী নির্যাতনের দৃশ্যটা কেন জানি মনে হচ্ছিল, আমার কলেজে পড়ুয়া মেয়েটির ক্ষুব্ধ চোখের দৃষ্টি থেকে যদি আড়ালে রাখতে পারতাম, তবে কতই না ভালো হতো।

ঘটনাটি এর আগেই পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু বিবরণটি টেলিভিশনে প্রদর্শিত হওয়া মাত্র এর মর্মান্তিক দিকগুলো যেন মুহূর্তেই হৃদয়-মনকে খামচে ধরল। প্রথমেই মনে হলো এদেশের প্রধানমন্ত্রী তো একজন মহিলা। বিরোধী দলের নেত্রীও একজন মহিলা। জন সমক্ষে বা সমাজ কাঠামোতে মেয়েদের বর্তমান অবস্থান একেবারেই যে হীন এটা তো ভাবা যায় না। তবুও দৈনন্দিন অসংখ্য ঘটনা ঘটছে যাতে মনে হয় বাংলাদেশের মুসলিম পরিবারগুলোতে বোধহয় নারীকে মানুষ বলে বিবেচনারই অভ্যেস গড়ে ওঠেনি।

মেয়েটির নাম ইতি। রাহেলা খাতুন ইতি। খুলনার মেয়ে। এক সন্তানের জননী। গত তিরানব্বই সালের জানুয়ারীতে তার বিয়ে হয় শফিকুল আলম নামক এক যুবকের সাথে। যুবকটি কাপড়ের ব্যবসায়ী। খুলনার আক্তার চেম্বারে তার দোকান।

বিয়ের অল্প কিছুদিন পরেই শুরু হয় বাপের বাড়ি থেকে তিনি লাখ টাকা এনে দেয়ার জন্য ইতিকে চাপ দেয়া। ইতির পিতা একজন সামান্য আয়ের লোক। তারপক্ষে মেয়ের শ্বশুর বাড়ির যৌতুকের দাবী মেটানোর সাধ্য বা সামর্থ্য নেই। প্রথমে ইতিকে

www.pathagar.com

মারধোর, গালিগালাজ ও উপোস রাখা হত। পারে তার অবস্থা অসহনীয় করে তোলা হয়। একদিন ইতির শ্বশুর-শাশুড়ী-ননদেরা তাকে বেদম প্রহার করে এবং এসিড স্প্রে করে তার মুখ ও শরীর পুড়িয়ে দেয়। এসিড দগ্ধ ইতিকে স্থানীয় একটি প্রাইভেট ক্লিনিকে ভর্তি করা হয়। মেয়ের ওপর এই মর্মান্তিক ঘটনার সংবাদ পেয়ে ইতির পিতা তাকে মুমূর্ষু অবস্থায় ডাক্তারের পরামর্শে ঢাকায় হাসপাতালে ভর্তি করে দেয়। এখন সে মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ছে। এদিকে যৌতুকলোভী পরিবারগুলো বধূ নির্যাতন বা বধের পর সদাসর্বদা যে পদ্ধতিতে বৌয়ের বাপ মাকে শাসিয়ে থাকে, ইতির শ্বশুরবাড়ির পুরুষ জানোয়ারগুলো ইতির পিতা-মাতা, ভাই-বোন সকলকে শাসিয়ে গেছে। এ ব্যাপারে এরা যে মামলা করেছেন অবিলম্বে সেই মামলা তুলে না নিলে সবাইকে হত্যা করা হবে বলে ভয় দেখানো হয়েছে।

আমাদের দেশে ও সমাজে এটি একটি প্রতিনিয়ত ঘটে চলা ঘটনারই বিবরণ মাত্র। সংবাদপত্র খুললেই প্রতিদিন কত ইতির যে ইতি হওয়ার সংবাদ দেখা যায় তা নিয়মিত পত্রিকা পাঠকদের অজানা নয়। তবুও কেন যে বাংলাদেশের শহরে বন্দরে, গ্রামে-গঞ্জে ঐসব যৌতুকলোভী পরিবারগুলো বধূ নির্যাতন কিংবা বধূ হত্যার মামলা কাটিয়ে উঠে সমাজ-সংসারে টিকে থাকতে পারে সেটাই এক গবেষণার ব্যাপার। নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে কঠোরতম আইন প্রণয়নের কথা আমরা সবাই জানি। কিন্তু প্রয়োগের কোনো দৃষ্টান্ত পাই না। পাই না বলেই ইতিকে যারা এসিডদগ্ধ করেছে তারা তার পরিবারের অন্যান্য সদস্যদেরও হত্যার হুমকি দিতে এতটুকু ভয় পায় না। আমরা বলছি না যে, ঐ আইনে কারো এ পর্যন্ত কোনো শাস্তি হয়নি। কিন্তু দৃষ্টান্তমূলক কিছু হলে নিশ্চয় দেশের মধ্যে এর একটা প্রভাব পড়তো।

আমরা আগেই বলেছি ইতির পিতা একজন সামান্য আয়ের লোক। তিনি খুলনা নিউজপ্রিন্ট মিলের সাবেক ইঞ্জিনিয়ার। ইতির বিয়ে কোনো প্রেমের বিয়ে নয় বলে জানা গেছে। সেটেল্ড ম্যারেজ। কাপড়ের দোকানী এক লোভী যুবকের সাথে ইতির ভাগ্যকে বেঁধে দেয়া হয়েছিল। ইতির পিতার যে ছবি সংবাদপত্রে ছাপা হয়েছে তাতে যে কোনো পাঠকই বুঝতে পারবেন যে সাদা চাপ দাঁড়িঅলা এই সৌম্য বৃদ্ধিটি তার সুশ্রী মেয়েটির সুখের জন্য একটি আত্মনির্ভরশীল জামাতা নির্বাচন করতে গিয়ে এক যুবক ব্যাবসায়ীকে দেখে আর কিছু বিবেচনা করার ফুরসৎ পাননি। ইতির শ্বশুরবাড়ীর লোকগুলো যে যৌতুকের টাকার জন্য ইতিকে এসিড স্প্রে করে পুড়িয়েও দিতে পারে, হয়তো ইতির পিতা প্রকৌশলী জনাব এম এ লতিফ কল্পনাও করতে পারেননি।

আমাদের প্রশ্ন হলো কেন তিনি তা পারেননি? ইতির লাঞ্ছনার যে বিবরণ পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে এতে তো মনে হয় ইতির শ্বশুর বাড়ির পৈশাচিক পরিবেশের কথা একটু অনুসন্ধান করলেই জানা যেতো। এ ধরনের বধূ বা নারী নির্যাতনকারীরা সাধারণত নিজেদের পারিবারিক ঐতিহ্য নিজেরা গোপন রাখতে

www.pathagar.com

চাইলেও আশেপাশের সকলেরই তা জানা থাকে। অর্থ, বিত্ত ও উচ্চ শিক্ষা এসব পরিবারের হিংস্র লোভ, নারী নির্যাতনের অভ্যেস এবং ঘরের বউকে ক্রীতদাসী করে রাখার রীতিনীতি বদলাতে পারে না। এখন নারী নির্যাতন প্রতিরোধে যে কঠোর আইন পাস হয়েছে, কেবল এর দৃষ্টান্তমূলক অব্যাহত প্রয়োগের মধ্য দিয়েই ঐসব জালেম শ্বশুরবাড়ীগুলোকে শায়েস্তা করা সম্ভব। আমরা এখানে এসিডদগ্ধ ইতির শ্বশুরবাড়ীটিকে একটি প্রতীক হিসেবে ধরে নিয়েছি এই আলোচনার সুবিধের জন্য। ইতির শ্বশুরবাড়ীর মত অসংখ্য যৌতুকলোভী পরিবার আমাদের আশেপাশেই আছে। কিন্তু আমরা তাদের ভদ্রবেশী চলাফেরা, অর্থবিত্ত, গাড়ী-বাড়ী, শিক্ষা-দীক্ষায় মজে গিয়ে জানোয়ারের সাথে নিজের প্রাণপ্রিয় সন্তানের সম্বন্ধ স্থির করে ফেলি। নবদম্পতির একটি দু'টি সন্তান জন্মের পরেই বেরিয়ে যায় যে, একটি জানোয়ারের সাথে শেষ পর্যন্ত আমরা রক্তেমাংসে জড়িয়ে গেছি। এখন এসব ব্যাপারে অর্থাৎ বিয়েশাদীর ব্যাপারে বাংলাদেশের সর্বত্রই একটি জিনিস পরিবারগুলোর প্রধান বিবেচ্য হওয়া উচিত। বিষয়টি হলো নতুন সম্ভাব্য সম্বন্ধের ব্যাপারে কোনো পক্ষ যৌতুকলোভী কি না? তাদের অতীত সম্বন্ধগুলোতে তারা যৌতুকের লেনদেন করেছিল কি না?

ইতির ঘটনাটি আমরা প্রকাশিত সংবাদের ভিত্তিতে একটি প্রতীক হিসেবে নিয়ে আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়েছি মাত্র। এর মধ্যে সত্যমিথ্যা নির্ণয়ের কাজ আমাদের নয়। এ কাজ পুলিশের। আমরা আলোচনা করছি ইতির বর্তমান অবস্থা এবং তার পিতা এম, এ, লতিফের জাতীয় প্রেসক্লাবে সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য এবং টিভির সচিত্র প্রতিবেদনের ভিত্তিতে। ইতির শরীর পুড়ে যাওয়ার পর তাকে খুলনা থেকে ঢাকায় চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে আনা হলে তার স্বামী এসে নাকি ইতিকে হুমকি দেয় যে, সে যদি এসিডে দগ্ধ হয়েছে বলে জবানবন্দী দেয়, তবে পরিণাম ভলো হবে না। তাকে বলতে হবে যে আগুন লেগে তার শরীর পুড়ে গেছে।

এদিকে পত্রিকান্তরে প্রকাশিত হয়েছে, এসিডে নয়। স্বামীকে ভয় দেখাতে গিয়ে ইতি নিজেকে নিজেই আগুনে পুড়িয়েছে। খুলনা প্রেসক্লাবে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে ইতির শ্বশুরবাড়ীর পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, তাদেরকে মিথ্যে মামলায় জড়ানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। ইতি নাকি খালিশপুর থানার ওসি, সহকারী পুলিশ কমিশনার এবং ডেপুটি পুলিশ কমিশনারের কাছে জবানবন্দীতে বলেছে সে স্বামীকে ভয় দেখানোর জন্য নিজের গায়ে আগুন দিয়েছে। তার স্বামী অন্য নারীর প্রেমে পড়েছে। তবে এ প্রসঙ্গে আমরা বিটিভির সচিত্র প্রতিবেদনটি স্বচক্ষে দেখেছি। সেখানে ইতির পিতা ও সম্পূর্ণ ঝলসে যাওয়া ইতির ক্ষীণকণ্ঠের বক্তব্য দেশবাসী শুনেছে।

তাছাড়া ইতির পিতার জাতীয় প্রেসক্লাবে দাঁড়িয়ে দেশের সরকার প্রধানের কাছে যে মর্মস্পর্শী আবেদন জানিয়েছে, সেটাকে উদ্দেশ্যমূলক বা বিদ্বেষপ্রসূত বলে উড়িয়ে দেয়ার কোনো যুক্তি নেই। তিনি দেশের প্রধানমন্ত্রীকে আহবান জানান, আপনি শুধু

www.pathagar.com

একটি বারের মত আমার মেয়েটিকে কিভাবে বর্বরের মত নির্যাতন করা হয়েছে, সেই নির্যাতনের চিহ্নগুলো দেখে যান। তিনি টিভি উপস্থাপকের পাশে দাঁড়িয়ে বাংলাদেশের সকল দর্শকের উদ্দেশে বলেছেন, তিনি মেয়ের চিকিৎসার জন্য তিনশ' টাকা দামের শেষ ইনজেকশনটি কিনে এনেছেন। এরপর আর কোনো ওষুধ কেনারও তার সাধ্য নেই। এরপর তার কিছু করারও নেই। তার এই কথাগুলো পিতৃ হতাশার শেষ বিন্দু থেকে উচ্চারিত। আমরা জানি না, এ পরিস্থিতিতে ইতির চিকিৎসার জন্য সরকারী পর্যায়ে এই দগ্ধ মেয়েটির জন্য হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের আর কিছু করার আছে কি না? যদি থাকে তবে আমাদের আকুল আবেদন, জনগণের সরকার ও সরকারী চিকিৎসা বিভাগ যেন মেয়েটির জীবন রক্ষার জন্য শেষ চেষ্টাটুকু করেন।

যৌতুকলোভী পরিবারগুলো বধূ নির্যাতনের পর এ নিয়ে শোরগোল পড়ে গেলে শাস্তি এড়াবার জন্য কতদূর যেতে পারে এবং কি কি পন্থা অবলম্বন করতে পারে তা দেশের বিবেকবান মানুষের অজানা নয়। ইতির ব্যাপারেও কি ঘটতে যাচ্ছে তা আমরা জানি না। তবে পুলিশের কাছে দেয়া জবানবন্দীটি যত গুরুত্বপূর্ণ অফিসারের সামনেই দেয়া হোক, এর চেয়ে আধিক মূল্যবান জবানবন্দী হলো সে টেলিভিশনের পর্দায় কোটি কোটি দর্শকের সামনে যে কথা বলেছে। দেশবাসী এসিডদগ্ধ ইতির মৃত্যুকাতর উচ্চারণে মিথ্যার কোনো লেশ আছে বলে সন্দেহ করেনি। আর পুলিশের কাছে ইতির জবানবন্দীটি গৃহীত হয়েছিল একটি প্রাইভেট ক্লিনিকে।

যা হোক, ইতির অবস্থা খুবই আশংকাজনক। যদি সে কোনোমতে মৃত্যুর সাথে লড়াই করে কোনোদিন উঠে দাঁড়াতে পারে তবে সে নিজেই প্রকৃত ঘটনার সাক্ষী হয়ে দাঁড়াবে। আমরা আন্তরিকভাবে কামনা করি ইতি সুস্থ ও স্বাভাবিক হয়ে উঠুক।

আমরা আগেই বলেছি যে, ইতির ঘটনাটিকে নারী নির্যাতনের একটি প্রতীক বিষয় হিসেবেই কেবল আলোচ্য করে তুলেছি। সম্প্রতি চীনের বেইজিংয়ে বিশ্বনারীদের ক্ষমতায়নের জন্য কত চেঁচামেচি হলো। কতজন কত কথা বললেন। আমরা বিশ্বের মুসলমানরা নারী বিয়য়ক আন্তর্জাতিক কোনো দলিলে তিল পরিমাণ ইসলাম বিরোধী কোনো কিছু থাকতে পারবে না বলে কত দৃঢ়তা নিয়ে সংগ্রাম করলাম। এ সংগ্রাম হয়ত বিশ্বের মুসলিম নারীরা চালিয়ে যাবেন আগামী শতাব্দী পর্যন্ত। কিন্তু একটি মুসলিম দেশের সমাজ অভ্যন্তরে রাহেলা খাতুন ইতিদের অবস্থার কি কোনো পরিবর্তন হবে? তা যদি না হয় আন্তর্জাতিক নারী ক্ষমতায়ন দলিলে কি লেখা থাকল, মুসলিম পরিবারিক জীবন নিয়ে বিজাতীয় ও বিধর্মীরা কি ষড়যন্ত্র করল-এ নিয়ে মাথা ঘামিয়ে কি কাজ হবে? আমরা তো নিজেরাই নিজেদের সমাজ জীবনের ভেতরকার ঘা দুর করতে পারি না।

১৬/৯/৯৫

www.pathagar.com

বস্তুনিষ্ঠতার আড়ালে অশ্লীলতা

সারা দেশব্যাপী যুবতী নারীর ইজ্জতের ওপর বেপরোয়া পৈশাচিক হামলার ঘটনা এমনভাবে সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে যে, প্রশ্ন জেগে উঠেছে এ দেশে আদৌ কোনো পরিবার নিরাপদ কি না? সম্প্রতি এ ধরনের ধর্ষণ মামলার সংবাদ পড়তে পড়তে আতংকগ্রস্ত পাঠকের মনে হতাশা বাসা বেঁধেছে। মেয়েদের সম্ভ্রমহানির ব্যাপারে কেউ আর আইন-শৃংখলার আশ্বাসবাণী শুনতে প্রস্তুত নয়। যেন সামগ্রিকভাবে দেশের সবকিছুকে ছাপিয়ে উঠতে চাইছে বিকারগ্রস্ত মানসিকতা। সমাজে যারা দুর্বল শ্রেণীর মানুষ, যারা যৌন অপরাধের বিচার চাইতে ভয় পায়, যারা অত্যাচারিত হয়েও ভাবে এসব নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করতে গেলে সামজে মুখ দেখানো যাবে না। কিংবা যাদের আইন-আদালত করে প্রতিকার করার আর্থিক সামর্থ্য নেই দেখা যাচ্ছে তাদের বৌ-ঝিদের ওপরই হামলা হচ্ছে বেশী। দিনাজপুরের ইয়াসমিনের হামলা এবং হত্যার ঘটনা যাদের দ্বারা সংঘটিত হয়েছে সাধারণত এদের কাছেই মানুষ প্রতিকারের আশায় ছুটে যায়। এখন অবশ্য পরিস্থিতি বদলে যাচ্ছে। অত্যাচারিত হয়েও কোনো নারী এখন আর পুলিশের শরণাপন্ন হতে ভয় পায়। সকলেই ধরে নেয় এর চেয়ে মুখ বুঁজে মরে যাওয়াও অনেক ভালো। যেসব দুর্বৃত্ত একটু সুযোগ পেলেই শ্রমজীবী শ্রেণীর কিংবা নিম্ন আয়ের পরিবারের যুবতী কন্যা কিংবা গৃহবধূদের ওপর যৌন লালসা চরিতার্থ করতে দলবদ্ধ হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে বর্তমান সময়ের আইন-শৃংখলা ব্যবস্থা তাদের রক্ষায় কোনো গ্যারান্টি বলেই এখন আর মেনে নেওয়া যায় না। নারীর সম্ভ্রম রক্ষায় দেশে অবিলম্বে কোনো স্বতন্ত্র রক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তুলতে না পারলে ধর্ষণের ঘটনা বন্ধ করা যাবে বলে আমরা মনে করি না। এর জন্যে সম্পূর্ণ নতুন ধরনের পুলিশ, স্বতন্ত্র থানা এবং কঠোরতম আইন প্রণয়ন করা বোধহয় একান্ত দরকার হয়ে পড়েছে। আইনের ধারায় কেবল যাবজ্জীবন কারাদন্ড কিংবা মৃত্যুদন্ডের বিধান থাকলেই হবে না। অপরাধী যাতে কঠোরতম দন্ড পায় তেমন দৃষ্টান্তও দরকার।

ধর্ষণের খবর ছাপতে পারলে এ দেশের সংবাদপত্রগুলো বোধহয় আর কিছু চায় না। এ ধরনের খবরে পাঠকের কি ধরনের প্রতিক্রিয়া হয়। ক্রমাগত নারীর সম্ভ্রমহানি, ধর্ষণ, হত্যা কিংবা এসিডে পুড়িয়ে দেয়ার সংবাদ সমাজ মানসে যে পরিস্থিতির সৃষ্টি করে। সেটা তলিয়ে দেখার দায়িত্ব সম্ভবত বাংলাদেশের বস্তুনিষ্ঠ সাংবাদিক জগত গ্রহণ করে বলে মনে হয় না। যে মেয়েটির ওপর জুলুম হয়েছে বলে খবর ছাপা হয় তার ছবি ছাপার জন্য সংবাদপত্রের লোকদের মধ্যে কাড়াকাড়ি পড়ে যায়। তার নাম, ঠিকানা,

www.pathagar.com

পিতার নামসহ বংশের কুলজী পর্যন্ত পাঠকরা পেয়ে যায়। কিন্তু যে ব্যক্তি বা যারা মেয়েটির এই দুর্দশার কারণ সে অপরাধীদের হয়তো একটা অস্পষ্ট উল্লেখ থাকে মাত্র। ধর্ষণকারীর পিতৃ পরিচয়, তার আত্মীয়-স্বজনের প্রভাব প্রতিপত্তি কিংবা তার নিজের ক্ষমতার কথা খুঁটিয়ে লেখা হয় না। ধর্ষণের খবরটিতে দেখা যায় রিপোর্টারের এক ধরনের ছদ্ম সহানুভূতি ভিকটিমের প্রতি উপচে উঠেছে। কিন্তু পুরো ব্যাপারটাই যে ভন্ডামিতে পরিপূর্ণ তা সচেতন পাঠকের কাছে সহজেই ধরা পড়ে যায়। বোঝা যায় ধর্ষণের বর্ণনা দিতে গিয়ে রিপোর্টার সাহেব ভিকটিমের প্রতি সহানুভূতির আঁঠা লাগাতে চাইলেও আসলে তা আঁঠা নয়, পানি। প্রকৃতপক্ষে এ ধরনের রিপোর্ট তৈরীতে তিনি নিজে খুব রোমাঞ্চিত এবং পুলকবোধ করেন। এতে যে ভিকটিমের নিজের এবং তার পরিবার-পরিজনের বাকী জীবনটাকেই সংবাদপত্র ছদ্ম সহানুভূতি দেখিয়ে বরবাদ করে দিলো তা আমাদের দেশের বস্তুনিষ্ঠ পত্র-পত্রিকার কর্তা ব্যক্তিরা বিবেচনা করেন না। এমনও দেখা যায় ধর্ষণের খবর সমস্ত খুঁটিনাটিসহ প্রকাশের পর যখন এর আইন-শৃংখলা প্রতিক্রিয়া দ্রুত এগিয়ে যায় তখনই ধরা পড়ে যে, পুরো স্টোরিটাই ছিল তথাকথিত ভিকটিম বা অতি উৎসাহী প্রতিবেদকের বানানো।

গত বুধবারের একটি দৈনিকে প্রথম পৃষ্ঠায় এক বলাৎকারের ভয়াবহ সংবাদ প্রকাশ করা হয়েছে। এতে বলা হয়েছে যশোরের এক গৃহবধূকে অপহরণের পর সাতজন যুবক তাকে রাতভর ধর্ষণ করে। মুমূর্ষু অবস্থায় ভিকটিমকে হাসপাতালে আনা হয়। এ ঘটনায় জড়িত তিনজনকে গ্রেফতারও করা হয়েছে ইত্যাদি। সংবাদ পরিবেশনের কায়দা, কি কি পদ্ধতিতে যুবক সাতজন ভিকটিমের কোন কোন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে বলাৎকার চালিয়েছে এর ফটোগ্রাফিক বিবরণ দেয়া হয়েছে। মেয়েটি ও তার স্বামীর নাম এবং ঠিকানাও যথারীতি রিপোর্টে সংযোজিত হয়েছে। তবে রক্ষা যে ভিকটিমের কোনো ছবি ছেপে এ ক্ষেত্রে পত্রিকাটি তাদের বস্তুনিষ্ঠতার পরাকাষ্টা প্রদর্শন করেনি। তবে সংবাদ প্রকাশের কায়দাটিকে অবশ্যই বাহবা দিতে হয়। মনে হবে ধর্ষণ-বলাৎকারের বিরুদ্ধে বুঝি পত্রিকাটি জেহাদ ঘোষণা করছে। প্রথম পৃষ্ঠার লীড নিউজের চেয়েও গুরুত্ব দিয়ে যে সংবাদটি প্রকাশ করা হলো স্বভাবতই আইটেমটির প্রতি সংবাদপত্র পাঠকদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হবে। যারা ঐ পত্রিকাটির নিয়মিত পাঠক নয় তারাও ঐ ধরনের একটি ডিটেল জানার জন্য পত্রিকাটি খুঁজবে। পত্রিকাটির উদ্দেশ্যও এটাই।

কিন্তু যশোরের ঐ গৃহবধূটির ধর্ষণ সংক্রান্ত বিবরণের জন্য একটি বিপরীত ভাষ্য ভিন্ন পত্রিকায়ও ছাপা হয়েছে। এতে বলা হয়েছে, যশোর শহরের নীলগঞ্জ শ্মশান ঘাটে ধর্ষণের শিকার গৃহবধূর (২২) ডাক্তারী পরীক্ষা যশোর জেনারেল হাসপাতালে সম্পন্ন হয়েছে। পরীক্ষায় ঘটনার বিবরণ এবং ভিকটিমের বক্তব্যের মধ্যে গরমিল আছে। জানা গেছে, ৭ জন মিলে ঐ গৃহবধূকে সারারাত ধরে বিভিন্ন উপায়ে ধর্ষণ করলেও ডাক্তারগণ

www.pathagar.com

তার গায়ে তেমন কোনো আলামত খুঁজে পাননি। তিন সদস্য বিশিষ্ট ডাক্তারদের একটি কমিটি ভিকটিমকে পরীক্ষা করেন। খবর বলা হয়েছে, যতটা বিভীষিকাময় করে সংবাদটি ইতোপূর্বে প্রচার করা হয়েছে, ভিকটিম নিজে নাকি বিষয়টাকে ততটা গুছিয়ে ডাক্তারের কাছে বর্ণনা করতে পারেনি।

ধরে নেয়া যাক ভিকটিম লজ্জায় তা পারেনি। ঘটনা যখন ঘটেছে তখন নিশ্চয় এর পেছনে কিছু কার্যকারণ ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। প্রথম যারা বিষয়টিকে ভয়াবহ করে প্রথম পৃষ্ঠায় লীড নিউজের সমমর্যাদায় প্রকাশ করলেন, তারা নিশ্চয়ই কার্যকারণের কিছু ছিটেফোঁটা জানেন। একেবারে বিনা সূত্রে কোনো পত্রিকা এধরনের বিভীষিকাময় প্রতিবেদন নির্মাণ করতে পারে বলে আমরা মনে করি না।

এ ব্যাপারে অন্য একটি সংবাদপত্রের পক্ষ থেকে যশোর কতোয়ালী থানার ওসির সাথে যোগাযোগ করা হলে ওসি জানান, তদন্তে দেখা গেছে, ভিকটিম জনৈক পরিবহন শ্রমিকের দ্বিতীয় স্ত্রী। এর আগে তার একটি বিয়ে হয়েছিল। বর্তমানে সতীনের ঘরে অশান্তি লেগেই আছে। ভিকটিমের অভিযোগ, সতীনই তাকে দুর্বৃত্তের হাতে তুলে দিয়েছে। এই চাঞ্চল্যকর খবর প্রকাশিত হলে যশোরের জেলা প্রশাসক, পুলিশ সুপার ও অন্যান্য ব্যক্তিবর্গকে নিয়ে সেখানে মিটিং করেছেন। এলাকাবাসী ঘটনার সত্যমিথ্যা নির্ধারণের জন্য এলাকায় একটি পুলিশ কাম্প বসাবার দাবী জানিয়েছে।

এই হলো একটি বিভীষিকাময় ধর্ষণ রিপোর্টের ইতিবৃত্ত। ঘটনার সত্যাসত্য নিশ্চয়ই তদন্তেই বেরিয়ে আসবে। প্রকৃত ঘটনাকে আশা করা যায় এখন্ আর কেউ ধামাচাপা রাখতে পারবে না। আমাদের বক্তব্য হলো ঘটনাটিকে যেভাবে দেশবাসীর কাছে পরিবেশন করা হয়েছে সেটা কি সংবাদপত্রের ইথিক্সে পড়ে? সাত যুবক ধর্ষণকারীর বলাৎকারের যে খুঁটিনাটি বিবরণ পত্রিকাটিতে লীড নিউজের চেয়েও গুরুত্ব দিয়ে ছাপা হলো সেটা কি বাংলাদেশের রুচিকে আহত করে না? যদি ধরে নেয়া যায় সংবাদটি সত্য বলেই প্রতিবেদক বস্তুনিষ্ঠতার দায় মেটাতে ডিটেলে গেছেন তা হলে কি এ প্রশ্ন কোনো পরিবারের অভিভাবক তুলতে পারেন না যে, এ ধরনের নোংরা, অপরিশীলিত ও আতংকজনক সংবাদ পরিবেশনের ফলে অল্প বয়স্ক কিশোর-কিশোরীদের মনের ওপর এক ভীতিজনক চাপ ও প্রতিক্রিয়া সৃষ্টির জন্য সমকালীন সাংবাদিকতাই দায়ী?

নারীর ওপর বলাৎকারের খবর আগেও খবরের কাগজে প্রকাশ হয়ে আসছে। এ ধরনের খবরে আগের কালে দেখতাম পাঠকের মনে নিজের দেশ ও সমাজ সম্বন্ধে অনুশোচনার সৃষ্টি হতো। পাঠকের মনে এমন একটি ভাবের উদয় হতো যে, ভিকটিম তার নিজেরই কন্যা, স্ত্রী কিংবা বোন। আর আজকাল এ ধরনের সামাজিক অবক্ষয়ের পরিণামে যখন কোনো দুর্ঘটনা অর্থাৎ নারীর ওপর যৌন হামলা ঘটে যায়, তখন এর সংবাদ পরিবেশনের সমকালীন পদ্ধতির বৈগুণ্যে বিষয়টা হয়ে যায় পাঠকের কাছে

www.pathagar.com

কৌতূহলোদ্দীপক, পুলক সঞ্চারী অথবা বিভীষিকাময়। যেন ভিকটিম এ সমাজ তথা আমাদের কেউ নয়। সংবাদ পড়ে এ মনোভাব এখন জাগে না ভিকটিম মেয়েটি যখন আমাদেরই মুসলিম পরিবারের সদস্যা তখন সে তো আমারই কন্যাতূল্য। এই দুর্ভাগ্যের খবর পড়ে কারো কি পুলকিত হওয়া উচিত?

সাধারণত যারা মেয়েদের ওপর বলাৎকারের সচিত্র সংবাদ প্রকাশে বেশ সিদ্ধহস্ত তারা নারী স্বাধীনতারও খুবই উৎসাহী প্রবক্তা হয়ে থাকে। নারী স্বাধীনতার তাদের কাছে একটা অর্থ হলো নারীকে উদোম করে ফেলা। একটি গৃহবধূ ধর্ষিতা হলে তার প্রতি সহানুভূতির ছলে যারা ছবি ছাপা থেকে শুরু করে তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বর্ণনা দিতে সবিশেষ পারদর্শিতা দেখান তাদের বিষয়ে সন্দেহ থেকেই যায় যে, হয় তারা মধ্যযুগীয় সামন্ততান্ত্রিক মনোবৃত্তির দ্বারা আক্রান্ত কিংবা কোনো প্রকার যৌন বিকৃতির শিকার।

দেশ, সমাজ-সংসার এবং জাতীয় ঐতিহ্যের পরিপন্থী সাংবাদিক বস্তুনিষ্ঠতা মূলত বস্তুবাদের কাছেই আত্মসমর্পণ মাত্র। সত্তুরের দশক থেকে আমাদের সংবাদপত্রে বস্তুনিষ্ঠার সাথে এই বিবেকহীন নিষ্ঠুরতা প্রাধান্য পেয়ে আসছে। সমাজের শত সহস্র পরিবার সমূহের ঘন সংবদ্ধ হয়ে পরস্পর জড়াজড়ি করে বেঁচে থাকার মধ্যে একটা মানবিক উদ্যমের স্রোত বয়ে চলেছে। জীবনের স্রোত লক্ষ্য করে কেউ যদি নোংরা নিক্ষেপ করে তবে তাতে বাহাদুরি নেই। তবু সমস্ত অঘটন চেপে গিয়ে সংবাদপত্রকে নিরাসক্ত থাকতেও আমরা পরামর্শ দিতে পারি না। আমাদের বক্তব্য হলো অসামাজিক ঘটনা প্রকাশের ভাষা হবে অতিশয় সতর্কতামূলক। সংবাদটি এ জন্যই প্রকাশিত হবে কারণ সমাজে একটি অনাকাংখিত দুর্ঘটনা ঘটেছে। এর আইন-শৃংখলাজনিত প্রতিকার প্রয়োজন বলে সংবাদপত্র এর নিরপেক্ষ বিবরণ প্রকাশের দায়িত্ববোধ করবে। কিন্তু সমাজে যৌন জুলুমের পুলক সঞ্চারের কিংবা অল্প বয়স্ক কিশোর-কিশোরীদের মধ্যে নিজেদের পরিবেশ সম্বন্ধে ভীতি সৃষ্টি করার মত ডিটেলে যাওয়া এক ধরনের অপরাধ। সত্যনিষ্ঠা কিংবা বস্তুনিষ্ঠতার কথা বললে এ অপরাধ স্খালণ হয় না।

২৯/৯/৯৫

www.pathagar.com

ওড়না সংকট ঃ বেনজীরের পরামর্শ এবং ফ্রান্স

ফ্রান্সে মুসলিম মেয়েদের ওড়না বা মস্তকাবরণ ব্যবহার নিষিদ্ধ করার প্রতিক্রিয়া সারা বিশ্বের মুসলিম জনগণকেই বিক্ষুব্ধ করেছে। যেসব মুসলিম রাষ্ট্রে পর্দার ব্যাপারে তেমন কড়াকড়ি নেই অর্থাৎ যেসব দেশে ইসলামী শরীয়ত বা আইন সরকারীভাবে চালু নেই সেসব দেশের নরনারীও ফরাসী শিক্ষা কর্তৃপক্ষের এই অন্যায় নিষেধাজ্ঞায় ক্ষুব্ধ। সবচেয়ে অসন্তোষ সৃষ্টি হয়েছে ফ্রান্সের মুসলিম নাগরিকদের মনে। তারা সম্ভবপর সব উপায়ে এই অগণতান্ত্রিক এবং ধর্মীয় বিদ্বেষে পরিপূর্ণ সাম্প্রদায়িক নিষেধাজ্ঞাটির বিরুদ্ধে তাদের প্রতিবাদ জানিয়ে যাচ্ছেন। যারা হয়ত নিয়মিত স্কার্ফ পরেন না তারাও পবিত্র কুরআনের অবশ্য পালনীয় একটি বিধানের ব্যাপারে ফরাসী সরকারের পক্ষপাতমূলক আচরণের নিন্দা না করে পারেননি। কেন ফ্রান্সের মুসলিম স্কুলছাত্রী নিরীহ তরুণীদের একটি অপরিহার্য পোশাকের বিরুদ্ধে গণতন্ত্রের ধ্বজাবাহী ফরাসী শিক্ষা কর্তৃপক্ষের এই আক্রোশ?

শোনা যাচ্ছে, প্রথম যে মন্ত্রী মহোদয় মুসলিম স্কুল ছাত্রীদের বিরুদ্ধে এই অবস্থা গ্রহণ করেন তিনি নিজে একজন ইহুদী। খৃস্টান মেয়েরা বুকে ক্রুশ ঝুলিয়ে স্কুলে আসতে পারবে, ইহুদী মেয়েরা তাদের ঐতিহ্যবাহী টুপী পরে ক্লাসে ঢুকলে এতে কোনো আপত্তি নেই। আপত্তি কেবল মুসলিম তরুণীদের মস্তকাবরণের ওপর। এটা নাকি মৌলবাদী ধারণাকে উস্কে দেয়। ওড়নায় মাথার কেশ আবৃত করাটা নাকি সাংঘাতিক রকম মৌলবাদী আচরণ!

এর ফলে সারা ফ্রান্স তথা পারীর মুসলিম বাসিন্দারা সে দেশের বৃহত্তম সংখ্যালঘু সম্পদায় হওয়া সত্ত্বেও দারুণভাবে হতাশায় ভুগছে। কি করবে? ফ্রান্স তো আর একটা মুসলিম দেশ নয়। ফ্রান্সের বর্তমানে ক্ষমতাসীনদের সামগ্রিক রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীই হলো ইসলাম বিরোধী। তবে সে দেশের মুসলিম বাসিন্দাদের এবং মুসলিম নাগরিকদের অসন্তুষ্টিও যে অগ্রাহ্য করার মত ব্যাপার নয়, তা আমরা খানিকটা আন্দাজ করতে পারি। গত কয়েক সপ্তাহ ধরে ফরাসী কর্তৃপক্ষ বাইরের দুনিয়ার একজন মিডিয়েটর বা মধ্যস্থতাকারীর অনুসন্ধান করছিলেন। যিনি ফরাসী মুসলিমদের ক্ষুব্ধ আত্মায় কিছু পানি সিঞ্চন করবেন। যিনি কোনো মুসলিম দেশের প্রধান হয়েও মুসলমানদের ধর্মীয় ঐতিহ্যের বিপরীত কিছু স্তোকবাক্যে সেখানকার মুসলিম নাগরিকদের অসহায় অবস্থাকে আরও অসহায় করে তুলবেন।

সম্প্রতি ফরাসী সরকার তেমন একজন অতিথি পেয়ে ধন্য হয়েছেন। সেই অতিথি

www.pathagar.com

হলেন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী বনজীর ভুট্টো। বেনজীর তার ফ্রান্স সফরের প্রারম্ভেই ছাত্রীদের ওড়না, স্কার্ফ বা মস্তাকাবরণের ব্যাপারে স্থানীয় মুসলিম মেয়েদের বাড়াবাড়ি না করার জন্য ওকালতি শুরু করেছেন। তিনি বলেছেন, আমার পিতা যদি ঐ স্কার্ফ পরা আমার ওপর চাপিয়ে দিতেন তাহলে আজ আমি পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হতে পারতাম না। এ কারণেই ইসলামী জমহুরিয়াতে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী বেনজীর ভুট্টো ফরাসী মুসলিমদের মাথায় স্কার্ফ পরা নিয়ে স্কুল কলেজে জোরাজুরি করতে নিষেধ করেছেন।

আমাদের প্রশ্ন হলো, যে কূটনৈতিক স্বার্থ উদ্ধারের জন্য বেনজীর ফ্রান্স সফর করছেন তাতে পাকিস্তানের প্রকৃতপক্ষে কোনো লাভ হলো কি না? আমরা মনে করি কাশ্মীরের ব্যাপারে ফরাসী সমর্থন একটি আন্তর্জাতিক সমঝোতার বিষয়। কাশ্মীরের স্বাধীনতা সংগ্রাম এখন এমন এক পর্যায়ে উপনীত হয়েছে যে অবস্থায় ভারত বা পাকিস্তানের উপদেশ বা দমননীতি কোনটাই কাশ্মীরীদের বিবেচ্য বলে প্রতীয়মান হচ্ছে না। তাছাড়া জাতিসংঘও কাশ্মীরী জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের প্রশ্নে গণভোট অনুষ্ঠানে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। ফরাসী সরকার কাশ্মীরের স্বাধীনতা সংগ্রামের পুঙ্খাণুপুঙ্খ খবর রাখেন। আন্তর্জাতিক প্রতিশ্রুতির বাইরে নতুন কোনো পদক্ষেপের সম্ভাবনা ফ্রান্সের অপেক্ষাকৃত সীমিত। আর পারমাণবিক পরিস্থিতির প্রসঙ্গে বেনজীর যে প্রস্তাব দিয়েছেন, তাতে ভারত আগে থেকেই তাদের অসম্মতি জানিয়ে আসছে। পাকিস্তানের পারমাণবিক কূটনীতির পরাজয়ের জন্য পাকিস্তানী জনগণ ও সামরিক কর্তৃপক্ষ বেনজীরকেই অহরহ দায়ী করে থাকেন। পাকিস্তান মানেই হলো ভারতীয় আগ্রাসনের ভয়ে ভীত একটি উপমহাদেশীয় ভূখণ্ড। এ কারণে বেনজীরের পিতা একদা ঘাস খেয়ে আণবিক বোমা বানানোর শপথ উচ্চারণ করেছিলেন। জুলফিকার আলী ভুট্টো তখন যদি বুঝতে পারতেন তার পাশ্চাত্য শিক্ষিত কন্যাটি ভবিষ্যতে একদিন পাকিস্তানের পারমাণবিক কর্মসূচীরই উচ্ছেদ ঘটাবেন তবে তিনি যে কন্যার কৈশোরেই তাকে ওড়না পরতে পীড়াপীড়ি কিংবা বাধ্য করতেন এতে কোনো সন্দেহ নেই। বেনজীর বলেছেন, বাল্যে তাকে ওড়না পরতে বাধ্য করলে তিনি আজ পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হতে পারতেন না। আমাদের প্রশ্ন হলো, তিনি প্রধানমন্ত্রী না হলে পাকিস্তানের কি আদৌ কোন ক্ষতি হতো? তার একথা মনে রাখা উচিত, তার প্রধানমন্ত্রীত্বের সাথে বিশ্বের কোটি কোটি মুসলিম নারীর জীবনধারণ প্রণালী বা আশা-আকাংখার কোনো সম্পর্কই নেই। বিশ্বব্যাপী মুসলিম নারীরা মাথায় স্কার্ফ রেখেই একটি নতুন বিশ্ব গড়ার স্বপ্ন দেখেছে এবং সংগ্রামে অংশগ্রহণ করছে। বেনজীর ভুট্টোরা সেখানে কোনো বিবেচ্য বিষয় বা মুসলিম নারীর আদর্শ হিসেবেই গণ্য নন।

বেনজীর ফরাসী মুসলিম নাগরিকদের গায়ে পড়ে যে উপদেশ খয়রাত করেছেন তা ইসলমের বরখেলাপ। তার কাছে বিশ্বের কোনো মুসলিম নারীই তাদের শালীনতার বিষয়ে কোনো ফতোয়া বা পরামর্শ চায়নি। তারা মুসলিম হিসেবে জীবন ধারণ করতে

www.pathagar.com

হলে কিভাবে পোশাক পরিচ্ছদ পরতে হবে তা পবিত্র কুরআন ও মুসলিম পরিবারের ঐতিহ্যবাহী পবিত্র আবহাওয়া থেকেই শিখে থাকে। ফ্রান্সের মুসলিম ছাত্রীদের সংগ্রাম হলো সারাবিশ্বের মুসলিম খাওয়াতীনের সংগ্রাম। এ সংগ্রামের সাথে না সামাজিক, না কোনো রাজনৈতিক আপোস সম্ভব। কই বেনজীর তো ফরাসী খৃস্টান বা ইহুদী ছাত্রীদের ঐতিহ্যবাহী ক্রুশ ধারণ বা ইহুদী প্রতীক চিহ্ন ব্যবহারের সাম্প্রদায়িক অভ্যাসকে সমালোচনা করেননি? তারা যদি তাদের ধর্মীয় ঐতিহ্য স্বাধীনভাবে পালন করতে পারে তবে মুসলিম ছাত্রীদের কেন ওড়নার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি হবে?

বেনজীর ভুট্টো পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী বটে তবে মুসলিম উম্মাহর নারী-আদর্শের অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত নন। যারা মুসলিম নারীদের অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত তাদের নাম পৃথিবীর সব মুসলিম কন্যাদেরই জানা আছে। পৃথিবীর সর্বজাতির মুসলিম মেয়েরা নিজেদের সাধ্যানুযায়ী তাদেরই অনুসরণ করবে। বেনজীর ভুট্টোর মত পাশ্চাত্যবাদী উন্মুক্তাদের নয়। বেনজীর ফ্রান্সে গিয়ে যে মধ্যস্থতা করলেন তা সেখানকার নাগরিক অধিকার বঞ্চিত এবং প্রকাশ্যভাবে সাম্প্রদায়িকতার শিকার লক্ষ লক্ষ মুসলিম সংখ্যালঘুদের ক্ষুব্ধ হৃদয়ে দারুণ দহনক্রিয়ার সৃষ্টি করবে মাত্র। এতে তাদের অস্তিত্বের লড়াই থেমে থাকবে না। কারণ পবিত্র কুরআন সর্বজাতির মুসলিম নারীর ওপর যে বিধান বাধ্যতামূলক করেছে সেটা মান্য করার জেহাদ কিভাবে পরিত্যক্ত হতে পারে?

আমরা জেনে খুব দুঃখ পেয়েছি যে, ফরাসী সরকার কেবল মুসলিম ছাত্রীদের শিক্ষাকেন্দ্র থেকে বহিষ্কার করেই নিবৃত্ত হননি। তারা মুসলিম ধর্মীয় বিধানের বিরুদ্ধে অর্থাৎ মাথায় স্কার্ফ বা মস্তকাবরণ ব্যবহারের বিরুদ্ধে আইন প্রণয়ন করতে চাইছেন। আমরা একটি ধর্ম সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে, যে সম্প্রদয়টি ফ্রান্সে দ্বিতীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায় হিসেবে ফ্রান্সের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির সাথে জড়িত এবং ফরাসী জাতীয় সংবিধানের অনুগত তাদের ধর্মীয় ঐতিহ্য বিরোধী কোনো আইন প্রণয়ন না করতে অনুরোধ করি। এ ধরনের আইন ফ্রান্সের বহু বছরের উদারনীতি ও গণতন্ত্রের সংগ্রামকে কলুষিত করবে এবং খৃস্টান-মুসলমান সম্প্রীতিকে বিদ্বেষে পরিণত করবে। কি ক্ষতি হয় যদি মুসলিম ছাত্রীরা স্কার্ফ পরে তাদের স্কুলের খৃস্টান বা ইহুদী শিক্ষকদের পাঠদান অনুসরণ করতে চায়? তারা তো আর ফরাসী শিক্ষা পদ্ধতি বা স্কুলের শিক্ষা কারিকুলাম বদলানোর জন্য আন্দোলন করছে না।

যদি মুসলিম শিক্ষার্থীদের ওপর ফরাসী সরকার ও শিক্ষা কর্তৃপক্ষ জবরদস্তিমূলক নিষেধাজ্ঞা বজায় রাখতে অনমনীয় থাকেন তবে এর ফল যে ভালো হবে না তা আমরা আন্দাজ করতে পারি। ইতোমধ্যেই ফ্রান্সের মুসলিম নাগরিক ও সেখানকার বহিরাগত মুসলিমগণ তাদের ছেলেমেয়েদের জন্য স্বতন্ত্র বিদ্যালয় স্থাপনের বিষয় বিবেচনা করছেন। সম্ভবত এই কারণ ও হুমকির মুখে পড়েই ফরাসী কর্তৃপক্ষ আইন প্রণয়ন করে মুসলমানদের ধর্মীয় বিধান পালনে বাধা দিতে উদ্যত হয়েছেন। মনে হয় এক ধরনের

www.pathagar.com

প্রতিশোধাত্মক মনোবৃত্তি থেকেই সরকার এসব করছেন। এসব যে একটা গণতান্ত্রিক সরকার ও জাতির জন্য ক্রমাগত হাস্যকর হয়ে উঠতে পারে তা বিবেচনা করা হচ্ছে না। অথচ আমাদের মত পশ্চাৎপদ দেশের নড়বড়ে গণতান্ত্রিক বিধিব্যবস্থার দেশেও এসব ব্যাপারকে জুলুমবাজি বলে মনে হচ্ছে। একদেশদর্শিতা ফরাসী স্কুল ব্যবস্থাকে শেষ পর্যন্ত আরও সংকীর্ণ করে তুলবে মাত্র। ততোদিনে হয়তো মুসলিম সংখ্যালঘুদের সমানাধিকার আন্দোলন নিজেদের জন্য নিজেদের উপায় অবলম্বনের দিকেই ঠেলে নিয়ে যেতে থাকবে। এতে ফ্রান্সের সাধারণভাবে উদার ও গণতান্ত্রিক মনোভাবসম্পন্ন শিল্প-সাহিত্যানুরাগী সংখ্যাগুরু নাগরিকদের সাথে সংখ্যালঘুদের পার্থক্যই বাড়বে না- বিশ্বের প্রতিটি মুসলিম রাষ্ট্রের জনগণের মধ্যে সন্দেহ বাড়বে। মৌলবাদ-এর নামে ইসলামের সাথে বৈরিতা সাধনে ফ্রান্সের লাভের চেয়ে লোকসানই বেশী হবে।

এত কথার পর আমরা পাকিস্তানী প্রধানমন্ত্রী বেনজীর ভুট্টোর একটি কথাকে অত্যন্ত মূল্যবান মনে করি। তিনি বলেছেন, কমিউনিজমের পতনের পর পাশ্চাত্যের উচিত নয় ইসলামকে তাদের হামলার টার্গেট করা।

বেনজীর একটি মুসলিম দেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবেই এ কথা বলেছেন, এ কথা আমরা মনে করি না। বরং একজন দূরদর্শী মুসলিম নারী হিসেবেই একথা বলেছেন। যেমন তিনি কায়রোয় আয়োজিত জাতিসংঘের জনসংখ্যা সম্মেলনে অবাধ যৌনাচার, ভ্রূণ হত্যা, অশ্লীলতার বিরুদ্ধে মুসলিম জগতের তথা সকল ধর্মীয় বিশ্বাসের পক্ষে দাঁড়িয়েছিলেন। এতে সারা মুসলিম জাহানের আলেম সমাজ ও ধর্মবেত্তাগণ একবাক্যে বলে উঠেছিলেন, এই তো একজন মুসলিম নারী ইসলামের স্বার্থরক্ষায় দন্ডায়মান হয়েছেন। বেনজীরের সেটাই প্রকৃত ভূমিকা। আমরা ঐ ভূমিকার প্রশংসা করি। আর ফ্রান্সে তিনি যে মধ্যস্থের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে চেষ্টা করেছেন সেটা তার পাশ্চাত্য শিক্ষার অহংকার মাত্র। সেটা আল্লাহর কালাম দ্বারা সমর্থিত নয়। মুসলিম যুবতীদের পাশ্চাত্য শিক্ষার দ্বন্দ্ব এই দ্বৈত আচরণের জন্ম দেয়। বেনজীরকে সাধারণত ঘোমটা বা সাদা ওড়নাতেই কর্মক্ষেত্রে এবং সভা-সমিতিতে দেখা যায়। কারণ একটি মুসলিম দেশের প্রধানমন্ত্রী মাথায় কাপড় রাখবে না এটা বোধ হয় নিজের দেশের মানুষের কাছেই গ্রহণযোগ্য নয়। যা হোক এই দ্বৈত আচরণ পরিত্যাগ করে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীকে মুসলিম উম্মাহর পক্ষে দাঁড়াতে বলি। পক্ষে দাঁড়াতে কূটনৈতিক অসুবিধা থাকলে অন্তত বিরোধিতা পরিহার করতে অনুরোধ করি। ফরাসী মুসলিম ছাত্রীদের মস্তকাবরণ ধারণ করাটা কোনো মৌলবাদী আচরণ নয়-বরং ধর্মীয় বিধান পালন এবং নিজেদের স্বতন্ত্র সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বজায় রাখার সংগ্রাম মাত্র। এখানে জেদাজেদির কিছু নেই।

৬/০১/৯৪

www.pathagar.com

অপরাধের ঘটনা সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে

নারী ধর্ষণের মত বিকারগ্রস্ত অপরাধ প্রবণতার মাত্রা বৃদ্ধি পেয়েছে। বিশেষ করে শ্রমজীবী মেয়েরা যারা বাইরে এসে কাজ করতে বাধ্য হয় তাদের ওপরই যৌন পীড়নের অভিযোগ বেশী। বাংলাদেশে মূলত এমন কোনো সুসভ্য সামাজিক আবহাওয়া এখনও আমরা গড়ে তুলতে পারিনি যেখানে একটি যুবতী মেয়ে একাকী বাইরে এসে নিরাপদে ঘরে ফিরতে পারে। বৃটিশ আমলের এতদসংক্রান্ত শিথিল আইন-কানুন, নারীর শ্লীলতা বিষয়ে সাম্রাজ্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গী এবং ঔপনিবেশিক শাসন কর্তৃপক্ষের অসংযত জীবন যাপনের ফলে নারীর সম্ভ্রমের বিষয়টি অতীতে যেমন যথাযোগ্য মর্যাদা পায়নি, বর্তমানে আইন-কানুন আগের চেয়ে কঠোর হলেও আইন প্রয়োগের জটিল পদ্ধতির কারণে তাতে আশানুরূপ ফল পাওয়া যাচ্ছে না। নারী ধর্ষণের মামলায় দুয়েকটা দৃষ্টান্ত ছাড়া বলা যায় অপরাধীদের কোনো শাস্তিই হয় না। প্রমাণাভাবে অধিকাংশ অপরাধী ছাড়া পেয়ে যায়। দরিদ্র শ্রেণীর অসহায় যুবতী নারীকে পথে-ঘাটে-কর্মক্ষেত্রে জবরদস্তিমূলকভাবে যৌন পীড়ন করলে এর কোনো শাস্তি হবে এমন কোনো ধারণাই আমাদের সমাজে নেই। যেটুকু শালীনতা-সম্ভ্রম এবং মহিলাদের প্রতি দায়িত্ববোধ আমাদের দেশে টিকে আছে সেটুকুও কেবল ধর্মীয় নীতিবোধের কারণেই টিকে আছে। ইসলাম ধর্মই আমাদের বারো কোটি মানুষের সামাজিক নৈতিকতাবোধকে ধরে রেখেছে। ইসলামী অনুশাসনের ছায়া বাংলাদেশের পারিবারিক জীবনের ওপর না থাকলে আমাদের দশাও হতো সিঙ্গাপুর বা থাইল্যান্ডের মত। বাংলাদেশের যেসব পরিবারে ইসলামী নীতিবোধের বালাই নেই সেসব পরিবারের মেয়েরাই একটু বেশী বেপরোয়া। নানারূপ অপকর্মের ভোগান্তিও তাদের অপেক্ষাকৃত বেশী তবে তাদের অপকর্ম নিয়ে মামলা মোকদ্দমাও তেমন হয় না। যৌন পীড়ন, ধর্ষণ বা অন্যবিধ যৌন বিকৃতি তাদের উচ্চাকাংখী পারিবারিক আবেষ্টনীতে এমনিতেই হজম হয়ে যায়। এটাকে কোনো মারাত্মক অপরাধ বলে কেউ তেমন গ্রাহ্য করে না। এসব পরিবারের মেয়েদের প্রদর্শনীমূলক সাজ-সজ্জা, প্ররোচনামূলক উলঙ্গতা ও যথেচ্ছ বিচরণই সমস্ত পাপের উৎস।

সমাজে যারা ইসলামী শালীনতা যথাসম্ভব মেনে জীবনযাপন করে তাদের ওপর যথেচ্ছ যৌন আক্রমণ কিংবা ধর্ষণের মত পৈশাচিকতার অভিযোগ অপেক্ষাকৃত কম। কলকারখানায় কর্মরত মেয়েরা, গার্মেন্টস শ্রমিক মেয়েরা কিংবা বাসায় কর্মরত মেয়েরা মূলত যৌন প্ররোচনামূলক চলাফেরায় অভ্যস্ত না হলেও এ সময়ে তাদের ওপরই এই বর্বরতা অধিকহারে সংঘটিত হচ্ছে। তবে তারা যখন দলবদ্ধভাবে কাজে যায় কিংবা

www.pathagar.com

বাড়ীতে ফিরে আসে তখন তাদের ওপর পশুরা লালসা চরিতার্থ করার কোনো সুযোগ পায় না। যেসব গার্মেন্টস শ্রমিক কোনো পুরুষসহ কর্মক্ষেত্রে যাতায়াত করে তারাও অপেক্ষাকৃত নিরাপদ। বিপদ হলো যারা অবস্থা বিপাকে একাকী সকাল-সন্ধ্যায় বাইরে চলাফেরা করে তাদের নিয়ে। কেবল যে দরিদ্র পরিবারের শ্রমিক মেয়েদেরই একলা পথ চলায় বিপদ এমন নয়। যে কোনো সম্ভ্রান্ত পরিবারের উচ্চশিক্ষিত যুবতী মেয়েদেরও এ দেশে একাকী পথচলা নিরাপদ নয়। কারণটা আগেই বলেছি, কোনো নিঃসঙ্গ পথচারিণীর গায়ে হাত দিলে কঠোর শাস্তি পাওয়ার ধারণাই এদেশে গড়ে ওঠেনি। দু'শ বছরের উপনিবেশিক শাসন আমলে এ দেশের সাবেক নীতিবোধ ও অনৈসলামিক আইন-কানুন-বিচার পদ্ধতি সব তালগোল পাকিয়ে গেছে। এ অবস্থায় সমাজে নারী নির্যাতন, ধর্ষণ ও হত্যার বিচার পাওয়া খুবই মুশকিল। এর ফলে এ দেশে বিচার প্রার্থিনীকে একা পেলে একশ্রেণীর পুলিশও গায়ে হাত দিতে দ্বিধা করে না। এ দেশে পুলিশ-দারোগা-উকিল সকলেই সুযোগ পেয়ে মেয়েদের গায়ে হাত দিয়েছে এমন নজিরও আছে। এর থেকে বাঁচতে হলে মেয়েদের গায়ে হাত দেয়ার নিঃসঙ্গ যোগ যথাসম্ভব কমিয়ে আনতে হবে। ইসলামী বিধি-বিধান অনুযায়ী মেয়েদের চলাফেরা ও কর্মক্ষেত্রে আসা-যাওয়া নিরাপদ ও নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। শ্রমিক মেয়েরা যথাসম্ভব দলবদ্ধভাবে যদি ফ্যাক্টরীতে আসা-যাওয়া করতে পারে তবেই বাঁচোয়া। গার্মেন্টিসের মালিকরা যদি শ্রমিক মেয়েদের আসা-যাওয়ার ব্যাপারে কোনোরূপ নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারতো তবে কতই না ভালো হতো।

এখানে গার্মেন্টস শ্রমিকরা কিভাবে বিকৃত রুচির ঘাপটি মেরে থাকা যুবকদের দ্বারা ধর্ষিতা হয় এর একটি উদাহরণ দিচ্ছি। খবরটি দু'দিন আগে পত্রিকান্তরে প্রকাশ পেয়েছে। রিপোর্টের ধরনটিতে বেশ প্রতিবাদী সুর লেগেছে। কিন্তু যতটুকু জানা গেছে, অভিযোগটি যাতে ঢিমে তেতালায় পর্যবসিত হয় সে কারণে কিছু লোকের শৈথিল্য শুরু হয়ে গেছে।

ঘটনাটি হলো, কুলসুম নামে এটি দরিদ্র মুসলিম যুবতী চট্টগ্রামের বায়েজিদ বোস্তামী এলাকার একটি গার্মেন্টিসে নতুন কাজ পেয়েছে। সে কিশোরগঞ্জের মেয়ে। নিতান্তই পেটের দায়ে কুলসুম নিজের ঘরবাড়ি ছেড়ে সুদূর চট্টগ্রামে গিয়ে ফুপাতো বোনের বাসায় আশ্রয় নিয়ে গার্মেন্টিসে কাজ ধরেছে। ঘটনার দিন সন্ধ্যে বেলায় সে ফ্যাক্টরীর কাজ সেরে ফেরার পথে বিবিরহাটে টেম্পো থেকে নেমে বাসার উদ্দেশে হাঁটা শুরু করলে একটু নিরিবিলি স্থানে তিনটি যুবক তাকে আটক করে এবং জোর করে একটি বাড়ীর তিনতলায় নিয়ে যায়। সেখানে আরও দু'জন যুবক অপেক্ষা করছিল। এই পাঁচটি নরপশু মিলে সারারাত মেয়েটির ওপর বলাৎকার চালায়। মেয়েটির কাকুতি-মিনতি ও ক্রন্দনে এই পাঁচটি অমানুষের হৃদয় গলে না। কিন্তু পাশের বাড়ীর লোকেরা বিষয়টি আঁচ করতে পেরে পুলিশে খবর দেয়। পুলিশ রক্তাক্ত অবস্থায় মেয়েটিকে উদ্ধার

www.pathagar.com

করে এবং ঐ বাড়ীটি ঘেরাও করে ধর্ষণকারী পাঁচ যুবককে গ্রেফতার করেছে। পাঁচজনের মধ্যে দু'জন ছাত্রদল দু'জন ছাত্র লীগ নেতা। অপরজন সন্ত্রাসী বলে পরিচিত। কোর্টে তাদের জামিন নামঞ্জুর হয়েছে। তবে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ফরেনসিক বিভাগ নাকি এখনো মেয়েটির মেডিকেল পরীক্ষার রিপোর্ট দেয়নি। কেন দেয়নি তা অবশ্য আন্দাজ করা যায়। যেখানে ছাত্রদল ও ছাত্রলীগের নেতার নাম ধর্ষণ মামলায় জড়িত সেখানে ঘাটে ঘাটে সুবিচার যাতে বাধাপ্রাপ্ত হয় সে চেষ্টাই এখন চলছে। আমরা মনে করি ধর্ষণ মামলার হাতেনাতে ধৃত অপরাধীরা যেহেতু প্রচন্ডভাবে রাজনৈতিক সন্ত্রাস সৃষ্টির ক্ষমতা রাখে সেহেতু মেয়েটির ডাক্তারী পরীক্ষাকে বড় করে দেখা সঠিক হবে না। এই বিষয়ে মেয়েটির জবানবন্দীর ওপরই মূল্য দিতে হবে বেশী। আমরা ধর্ষণকারীদের কঠোর দন্ড দাবী করি। আর এই ঘটনায় আমরা চট্টগ্রাম পাঁচলাইশ থানার কর্তব্যরত পুলিশ টহলদার দলটির প্রশংসা করি।

উপরোক্ত ঘটনাটি হলো বাংলাদেশের নারীদের ওপর প্রাত্যহিক শ্লীলতাহানির একটি নিত্যকার ঘটনার দৃষ্টান্ত। এ ধরনের যৌন পীড়ন প্রতিটি জেলা শহরে প্রায় প্রতিদিনই ঘটে চলেছে। পথ চলতি যুবতী বা কিশোরীদের ওপর হস্তক্ষেপের ঘটনা ক্রমাগত বেড়ে চলেছে। এখন এই ব্যাধিটির ভয়ে সারা সমাজ কাঠামোটিই নড়বড়ে হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে। দিনাজপুরের ইয়াসমিন হত্যা মামলার যে প্রতিক্রিয়া দেশের বিরাট অঞ্চলকে নাড়া দিয়ে গেছে এর লক্ষ্যযোগ্য দিকটি ছিল সাধারণ শ্রমজীবী মানুষের প্রচন্ড ক্ষোভ। এরা যেন আর কোনো প্রশাসনিক নিরাপত্তারই ধার ধারবে না। সেখানে অপরাধী ছিল কয়েকজন পুলিশ। কিন্তু আমাদের সমাজ জীবনে পুলিশ ও ছাত্রের মধ্যে অন্তত নারীর শ্লীলতা নষ্টের ব্যাপারে একই রকম বিকৃত মানসিকতা দেখা যাচ্ছে। কে পুলিশ, আর কে ছাত্র, একটি অসহায় যুবতী বা কিশোরী এদের কারো হাতেই নিরাপদ নয়। প্রশ্ন হলো কার হাতেই বা এ দেশে মা-বোনরা নিরাপদ?

আমরা মনে করি, আইন প্রয়োগকারী সংস্থার একশ্রেণীর সদস্য থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংগঠনগুলোর নেতৃস্থানীয় কিছু ব্যক্তির দৃষ্টিতেও যেখানে মেয়েরা কেবল লালসা মেটাবার উপাদান মাত্র। সেই সমাজ ব্যবস্থাকে অচিরে ভেঙে ফেলাই অধিকতর মঙ্গল।

আমরা পর্যালোচনা করে দেখেছি, কেবল ইসলামী সামাজিক পরিবেশ সৃষ্টির মধ্য দিয়েই এই পংকিলতা দূরীভূত করা সম্ভব। সাধারণত দেখা যায় যেসব পরিবারের ভেতরে ইসলামী শালীনতা মোটামুটিভাবে মেনে চলার রেওয়াজ আছে সেসব পরিবারের সদস্যরাই এসব অপকর্ম ও আক্রমণ থেকে এখনও মুক্ত আছে। যে কর্মজীবী নারী বাইরে গেলেও সাধ্যমত পর্দা মেনে চলে। অর্থাৎ যে কর্মজীবী মহিলার নিজেকে প্রদর্শনের মোহ কম কিংবা যিনি কর্মক্ষেত্রেও নিজেকে রেখে ঢেকে চলার অভ্যেস গড়ে তুলেছেন তার প্রতি ইশারা-ইঙ্গিত করার সাহসটুকুও কারো হয় না। অন্যদিকে যার

www.pathagar.com

সাজগোজ বেশী, যিনি নিজের আবরণীয় সৌন্দর্য উন্মুক্ত করে চলাফেরা করেন। তিনিই ফ্যাশন ও স্টাইলের দোহাই দিয়ে যুব সমাজকে ক্রমাগত প্ররোচিত করছেন। এরই শাস্তি ভোগ করছে সারা দেশের নারী সমাজ। আধুনিকতার নামে, নারী প্রগতির নামে কিংবা নারী স্বাধীনতার নামে একটি মুসলিম দেশ এই পাপাচারের মূল্য আর কত শোধ করবে? ধর্ষণ বিকৃতি হলো অনাবৃত নারী প্রদর্শনীরই এক অমোঘ শাস্তি। এ শাস্তির হাত থেকে রেহাই পেতে হলে সোজাসুজি পর্দার কাছে ফিরে আসতে হবে এবং মেয়েদের জন্য নির্বাচিত কর্মক্ষেত্রের সন্ধান করতে হবে।

শ্রমিক মেয়েদের ওপর যৌন পীড়ন চালানোর পেছনে আছে এক অদ্ভূত সামন্ততান্ত্রিক মনোভাব। কিছু বিকৃত রুচির মানুষের আচরণ এমন যে, এরা নিজেদের ঘরেও নারীদের ওপর পশুসুলভ আচরণে যেমন অভ্যস্ত তেমনি বাইরেও। এদের অপরাধের নিবৃত্তি হতে পারে কেবল কঠোর আইনগত ব্যবস্থায়। ধর্ষণ মামলার কোনো শাস্তি অধিকাংশ ক্ষেত্রে হয় না এটা একটি প্রচলিত প্রবাদে পরিণত হয়েছে। প্রমাণের অভাবে দেখা যায় অধিকাংশ ধর্ষণকারী হাসতে হাসতে মামলা থেকে বেরিয়ে আসে। এটা অবিলম্বে বন্ধ হওয়া উচিত। মহামান্য আদালতগুলোকে যে কেবল আইনের সূক্ষ্ম মারপ্যাঁচ বিবেচনা করেই একজন নারী ধর্ষণকারীর বিচার করতে হবে, এমন তো নয়। তারাই যেহেতু আইনের বিবেকবান বিশ্লেষণকারীও, কে অপরাধী আর কে নির্দোষ তা তাদের চেয়ে আর কে ভালো বোঝে?

আমরা চাই আমাদের দেশে নারী ধর্ষণের উদ্দামতা প্রশমিত হোক। যে অপরাধ করতে গিয়ে পুলিশ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রনেতাদের মধ্যে কোনো পার্থক্য থাকে না। সে অপরাধ দমনে কঠোরতর দন্ডদান ছাড়া অন্য কোনো পথ নেই। দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির সংখ্যা যত বাড়বে ততই এই অপরাধ স্তিমিত হবে।

২৭/১০/৯৫

www.pathagar.com

www.pathagar.com

আল মাহমুদ বাংলাভাষার অন্যতম প্রধান কবি ও কথাশিল্পীই নন, তিনি একালের অন্যতম প্রধান সম্পাদক ও সাংবাদিকও বটে। তাঁর সারা জীবনের এই পেশাগত দিকটির ওপর তেমন কোন আলোকপাত হয়নি। মুক্তিযুদ্ধের পর 'গণকণ্ঠ'-এর সম্পাদক হিসাবে তাঁর দুঃসাহসিক ভূমিকার কথা দেশবাসী কোনদিন বিস্মৃত হবেনা। কবিতা, সাহিত্য ইত্যাদি ছাপিয়ে তার বস্তুনিষ্ট সাংবাদিক সততা তখন সকলের দৃষ্টি আকর্ষণে সক্ষম হয়। এ সময় তাকে গ্রেফতার করে বিনাবিচারে এক বছর আটক রাখা হয়। আল মাহমুদ জেল থেকে ছাড়া পেয়ে দৈনিক সংগ্রামে বিভিন্ন ছদ্মনামে বেশকিছু উপসম্পাদকীয় লিখেছেন। আমরা ঐ রচনাগুলো থেকে বাছাই করে 'নারীনিগ্রহ' গ্রন্থটি প্রকাশ করলাম। নারীর সম্ভ্রম রক্ষায় আল মাহমুদের যুক্তি ও কলমের শক্তি পাঠককে মুগ্ধ করবে। তাছাড়া জগতব্যাপী মুসলিম নারীর পর্দা রক্ষার সংগ্রামের পক্ষে দাঁড়িয়েও যে নতুন যুক্তি প্রয়োগ করা যায় আল মাহমুদ এই বইয়ে তা অকপটে তুলে ধরেছেন। এ বই কবি আল মাহমুদের সাংবাদিক জীবনের একটি অনালোচিত দিকের উন্মোচন। বর্তমানে তিনি পুনরায় সাংবাদিকতায় ফিরে এসে চট্টগ্রামের বহুল প্রচারিত দৈনিক কর্ণফুলীর সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। আমরা পর্যায়ক্রমে তার সাংবাদিক জীবনের প্রবন্ধগুলো থেকে বাছাই করে আরো দু'একটি বই প্রকাশের ইচ্ছা রাখি।

প্রকাশক।